মধুসূদন কাব্য-পরিচয়

দীননাথ সান্যাল প্রণীত

সম্পাদক

শ্রীঅনন্ত প্রসাদ সান্যাল

প্রথম প্রকাশ ১৩৫৩

মূল্য দুই টাকা

এ, মুখাৰ্জ্জী এণ্ড কোং : কলিকাতা

সূচী

Published by A. R. Mukherjee, 2, Collage Square, Calcutta and Printed by Narayan Chandra Mukherjee at Emerald Printing Works Ltd. 1, Muktaram Babu St, Calcutta.

ভূমিকা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(জীবনী)

(১৮২৪ - ১৮৭৩)

যশোর-জেলার "কবতক্ষ"-নদী-তীরস্থ সাগরদাঁড়ি-গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ দত্ত-বংশে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী মধুসূদনের জন্ম হয়। তিনি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ধনে-মানে সে-সময়কার এক সম্ভ্রান্ত বংশ। তাঁহার পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত; মাতার নাম জাহ্নবী। মধুসূদন পিতামাতার একমাত্র পুত্র। রাজনারায়ণ কলিকাতায় ওকালতি-উপলক্ষে খিদিরপুরে বাস করিতেন।

মধুসূদনের বাল্য-শিক্ষা তাৎকালিক প্রথানুসারে গ্রামের "গুরু মহাশয়ের" কাছেই হইয়াছিল। নিকটবর্ত্তী এক গ্রামের মৌলবীর কাছে তিনি পার্সী-শিক্ষাও করিতেন। বাল্য-বয়সেই লেখাপড়ায় তাঁহার অসাধারণ উৎসাহ দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইত। পাঠশালায় তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। এই বয়সেই পাঠশালার পড়া ছাড়া, তাঁহার "উপরি" পড়াও ছিল। তিনি কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত পড়িয়া বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে শুনাইতেন। আদরের বালকের মুখে মধুর স্বরে ধর্ম্মগ্রন্থদ্বয়ের আবৃত্তি শুনিয়া স্ত্রীলোকেরা মুগ্ধ হইতেন। পরিণামে তাঁহার রামায়ণ-মহাভারত-প্রীতির উন্মেষ এই বাল্য বয়স হইতেই; এবং পরিণত বয়সে তিনি যে "গজল"-নামে প্রসিদ্ধ পারসিক গীতি-কবিতা বড়ই ভালবাসিতেন,—তাহাও এই বাল্য-শিক্ষার গুণে। জন্মাবধি তাঁহার মনে যে-একটা কাব্য-রসানুভূতি ছিল, বাল্যেই তাঁহার এই কাব্য-প্রীতি তাহার বীজ-স্বরূপ।

এই সময়ে কলিকাতায় ইংরেজী-শিক্ষার একটা নবীন উদ্যম দেখা দিল। নানাস্থানে

ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে থাকিল। তন্মধ্যে "হিন্দুকলেজ"ই ছিল সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। রাজনারায়ণ পুত্রকে ইংরেজী-শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আনিলেন। তখন মধুসূদনের বয়স তের বৎসর মাত্র।

মধুসূদন প্রথমে কিছুকাল খিদিরপুরের ইংরেজী-বিদ্যালয়ে পড়িয়া, পরে হিন্দু-কলেজে প্রবেশ করেন। এই হিন্দু-কলেজেই তখনকাব যুবকদিগেব পক্ষে ইংরেজী-প্রভাবে প্রভাবিত হইবার প্রধান কেন্দ্র স্থান ছিল। সে-কালের যে-কয়জন বাঙ্গালী পরিণত বয়সে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন, তাঁহাদেব অনেকেরই প্রতিষ্ঠা এই হিন্দুকলেজেব শিক্ষার গুণে। শিক্ষকদিগেব মধ্যে দুইজনেব প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—ডিরোজিয়ো (Derozio) ও রিচার্ডসন্ (Captain Richardson)। ডিবোজিযে৷ ছিলেন প্রগাঢ় দার্শনিক ও কবি। এই দুই গুণেব সমাবেশে তাঁহাব সাহচর্য্য ও প্রভাব ছাত্রদিগেব বড়ই প্রীতিকব ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। ইহাব ফলে, তাঁহাব ছাত্ররা স্বাধীন চিন্তায় অত্যধিক প্রলুব্ধ ও প্রণোদিত হইত। তিনি অল্পকাল মাত্র শিক্ষকতা কবিয়াছিলেন; কিন্তু এমন তাঁহাব প্রভাব ও মোহিনী শক্তি ছিল যে, ইহারই মধ্যে কোন-কোন ছাত্র ধর্ম্মদ্রোহী, তদপেক্ষা অধিক ছাত্র সমাজদ্রোহী, এমন কি, অনেকেই আস্তিক্য-দ্রোহী হইয়া উঠে; অন্ততঃ কলিকাতাব জন-সমাজেব তখন ঐরূপ ধারণাই জন্মিয়াছিল। কিন্তু রিচার্ডসন্ সাহেবেব প্রভাব অন্যরূপ। তিনি ছিলেন কাব্য-ও-নাট্যানুরাগী। সুতরাং তাঁহাব শিক্ষকতায় সাহিত্যামোদী ছাত্রগণেব সাহিত্য-চর্চ্চা সমধিক প্রবর্দ্ধিত ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইবাব সুবিধা পায়। মধুসূদন হিন্দু-কলেজে এই সময়ের ছাত্র ছিলেন। সে সময়ে তাঁহাব মত প্রতিভাবান্ ছাত্র কেহই ছিল না। তাঁহার সহপাঠী ভুদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় পবিণত বয়সে মধুসূদন-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ কবিয়া, ক্রমে-ক্রমে আমাকে অন্যূন ২০ লক্ষ ছাত্রের সংশ্রবে আসিতে হইয়াছিল; কিন্তু মধুব ন্যায় প্রতিভা আর কাহাতেও কখন দেখি নাই।" বিশেষতঃ ইংরেজী-সাহিত্যে তাৎকালিক কোন ছাত্রই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না, এ কথা সর্ব্ববাদী-সম্মত।

এই-সময় হইতেই তাঁহার কাব্য-শক্তির স্ফুরণ হইতে থাকে। তিনি বন্ধুদের

কাছে ইংরেজীতে কবিতা লেখা হইতে আরম্ভ করিয়া নানাবিধ গুরু-গম্ভীর কবিতা (sonnets, songs, epistles, odes &c) রচনা করিতে থাকিলেন এবং রিচার্ডসন্ সাহেব সেইগুলি সাময়িক পত্রিকাদিতে ছাপাইয়া মধুসূদনকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। মধুসূদনেব উপরে ইংরেজী-প্রভাব কেবলমাত্র ইংরেজী-সাহিত্যে অসাধাবণ ব্যুৎপত্তি ও ইংরেজীতে কবিতা রচনা করিবার প্রগাঢ় আসক্তিতেই পর্য্যবসিত হয় নাই; তিনি এই সময় হইতেই সাহেবিয়ানার অনুকরণেও সবিশেষ ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন।

হিন্দু-কলেজে তাঁহাব সহপাঠী অনেক ছাত্রই তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিলেন—গৌরদাস বসাক, রাজনারায়ণ বসু ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ইহার মধ্যে গৌরদাসই ছিলেন শেষ পর্য্যন্ত মধুসূদনের অন্তরের অন্তরঙ্গ—যেন মধুসূদনের দ্বিতীয় শরীর মাত্র—অভিন্নহৃদয়!

হিন্দু-কলেজে মধুসূদন যখন "সিনিয়ার"-বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র, তখন তিনি অকস্মাৎ খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণে প্রয়াসী হইয়া ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে "ওল্ডমিশন্ চার্চ্চে" খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তাঁহার দীক্ষা-নাম হইল "মাইকেল"। এই নামেই তিনি বাঙ্গালায় পরিচিত। কিন্তু 'মধু'ই বাঙ্গালীর মুখপ্রিয়। তিনি নিজেও কাব্যাদিতে 'মধু'র ব্যবহার করিয়াছেন। যাহা হউক, গুণবান্ একমাত্র পুত্রের এইরূপে গৃহত্যাগ ও ধর্ম্মত্যাগ পিতা মাতার পক্ষে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত-স্বরূপ হইয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। তাঁহাব বন্ধুগণও হঠাৎ এই ব্যাপার সংঘটনে অতিমাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। কলিকাতা শহরে এই উপলক্ষে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। কাহার প্ররোচনায় বা কি প্রলোভনে মধুসূদনের হঠাৎ এইরূপ মতি-গতি হইল, তাহা কেহই নিশ্চয় করিতে পারিল না। তবে দেশীয় প্রথায় বিবাহে একান্ত অনিচ্ছা এবং বিলাত-গমনের প্রবল ইচ্ছা, এই দুইটী মনোভাব এই ঘটনার মূলে বিদ্যমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দু-কলেজে পড়িবার সময়ে মধুসূদন ইংরেজীতে অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি যে ঈশ্বর-স্তোত্রটী

(Hymn) রচনা করিয়াছিলেন, এবং যাহা তাঁহাব দীক্ষা কালে গির্জ্জায় গীত হইয়াছিল, সেইটী এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

HYMN

BY M. S. DUTT, A HINDU YOUTH

(Composed by him to be sung at his baptism)

I

Long sunk in superstition's night,
By Sin and Satan driven,
I saw not, cared not, for the light
That leads the blind to Heaven.

II

I sat in darkness, Reason's eye
Was shut, was closed in me ;
I hastened to Eternity
O'er Error's dreadful sea !

III

But now, at length, Thy grace, O Lord !
Bids all around me shine !
I drink Thy sweet, Thy precious word,
I kneel before Thy shrine !

IV

I've broke Affection's tenderest ties
For my blest Saviour's sake ;
All, all I love beneath the skies,
Lord ! I for Thee forsake !

উনিশ-বৎসর বয়সেব বাঙ্গালী বালকের রচিত ঐরূপ ইংবেজী-কবিতা, ভাবে ও ভাষায় উপস্থিত ইংরেজদিগেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল।

ইংরেজ ও ভারতীয় খৃষ্টান যুবকদিগের উচ্চশিক্ষার জন্য সেকালে শিবপুরে

"বিশপ্‌স্ কলেজ" ছিল। কিন্তু সেখানে থাকিয়া লেখাপড়া করা প্রচুর ব্যয়-সাপেক্ষ। একমাত্র পুত্র গৃহত্যাগী হইলেও রাজনারায়ণ, পুত্রের উচ্চ শিক্ষার জন্য সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করিতে থাকিলেন। ঐখানে নানা-বিষয়িণী শিক্ষার সঙ্গে মধুসূদন গ্রীক্, লাতিন্, ও সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। অনায়াসে ভাষা শিক্ষা করিবার ক্ষমতা তাঁহার যেন স্বভাব-সিদ্ধই ছিল। পরিণত বয়সে তিনি আরও অনেক ভাষা শিখিয়াছিলেন। ইংরেজী-ভাষা ত তাঁহার পক্ষে ইংরেজেরই মত আয়ত্ত ছিল। ফরাসী-ভাষাতেও তিনি এমন ব্যুৎপন্ন ছিলেন যে, সেই ভাষায় সুন্দর কবিতাও রচনা করিতে পারিতেন ইহা ছাড়া, তিনি গ্রীক, লাতিন্, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করিয়া সেই-সব ভাষার উৎকৃষ্ট কাব্যাদির সম্যক্ রস গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এদিকে, নিজের মাতৃভাষা ছাড়া, সংস্কৃত, পারসিক, হিব্রু, তেলেগু, তামিল ও হিন্দী—এগুলিও অল্প বিস্তর তিনি জানিতেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর দিনে তাঁহার সমাধি-স্তম্ভ-প্রতিষ্ঠা-কালে ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয় বক্তৃতা-কালে বলিয়াছিলেন,—

"As a linguist and a scholar, he had scarcely any equal among his contemporaries, and there is hardly any individual even in these days among his countrymen who could excel him in his knowledge of the European languages and in the literature, both ancient and modern, of European countries."

প্রায় পাঁচ বৎসর মধুসূদন এই কলেজে থাকিয়া নানাবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। এমন সময়ে, পিতার সহিত মনোমালিন্য ঘটায় তিনি পিতার অর্থ-সাহায্যে বঞ্চিত হইয়া, ঐ কলেজের কয়েক জন মাদ্রাজী খৃষ্টান্ যুবকের পরামর্শে পিতা-মাতা বা বন্ধু-বান্ধব কাহাকেও কিছুমাত্র আভাস না দিয়াই ভাগ্য-লক্ষ্মীর অন্বেষণে মাদ্রাজী বন্ধুগণের সহিত মাদ্রাজে গেলেন। পিতা-মাতার পক্ষে কি বিষম সংবাদ! গৃহত্যাগী, ধর্ম্মত্যাগী হইয়াও পুত্র তবু এতদিন দেশেই ছিল; এখন একেবারে দেশত্যাগী হইল!

মধুসূদন ইংরেজীতে সুশিক্ষিত হইয়া বাহির হইয়াছেন। সুতরাং ইংরেজ-রাজত্বে কোথাও তাঁহার অন্নাভাব হইবার কথা নহে। মাদ্রাজে তিনি শিক্ষকতা করিয়া ও সংবাদ-পত্রাদিতে লিখিয়া যথাসম্ভব অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি মাদ্রাজে তাৎকালিক সুপ্রসিদ্ধ Athenoeum পত্রের প্রধান সম্পাদক হইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, তিনি Spectator প্রভৃতি অন্যান্য সংবাদ-পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

এই-সব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও আজন্ম-কবি মধুসূদনের কাব্য-প্রচেষ্টাব অবসরাভাব ছিল না। এই সময়ে তিনি *Captive Ladie* এবং *Visions of the Past* নামক কবিতাদ্বয় প্রকাশ করিয়া সেখানকাব সুধী-ইংরেজ-সমাজে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। Athenoeum কাগজে জনৈক ইংবেজ-সমালোচক *Captive Ladie* সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"what I believe neither Scott nor Byron would have been ashamed to own." মাদ্রাজ-প্রবাস-কালে তিনি ইংরেজীতে *Rizia* নামক একখানি নাট্যকাব্যও (Dramatic Poem) লিখিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ-ভাবে প্রকাশিত হয় নাই।

এইরূপে মাদ্রাজে ইংরেজ-সুধী-সমাজে মধুসূদনেব পরিচয় ও প্রতিপত্তি হইতে থাকিলে, তিনি তথাকার এক ইংরেজ-রমণীব পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু এ বিবাহ স্থায়ী হয় নাই। কয়েক বৎসর পরেই এই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া, তিনি তথাকাব প্রেসিডেন্সি-কলেজের জনৈক শিক্ষকের দুহিতা, কুমাবী হেন্‌রিয়েটাকে বিবাহ করেন। এই পত্নীই মধুসূদনের সুখ-দুঃখে জীবন-সঙ্গিনী হইয়া আমরণ তাঁহার সহিত গাঢ় দাম্পত্য-প্রেমে আবদ্ধা ছিলেন।

মাদ্রাজ-প্রবাস-কালে অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগের সহিত পত্র-ব্যবহারে বন্ধু-বৎসল মধুসূদনের ত্রুটী ছিল না,—বিশেষতঃ গৌরদাসের সঙ্গে। এক সময়ে বহুদিন কলিকাতার কোন বন্ধুর নিকট হইতেই কোন পত্রাদি না পাইয়া মধুসূদন গৌবদাসকে লিখিয়াছিলেন,—

My dear Gour,

Are you all dead ! or have I by some unintentional act or other offended you ? I really do not remember having received a single line from you or Bhoodeb for the last 3 months. *Et tu Brute ?* I refrain from saying anything with reference of myself, because in case you should have marched off to the grave, there is a chance of others reading this learned Epistle. Write to me if you are living and let us show a little more activity. Yours angrily.

P. S Mr Bhoodeb Mukerjee is a humbug, so is Mr Saroop Banerjee, so you are all. Bad luck to ye.

মধুসূদন বন্ধুদের সহিত, বিশেষতঃ গৌরদাস ও রাজনারায়ণের সহিত অনেক পত্র-ব্যবহার করিয়াছেন। সেই পত্রগুলি সুন্দর ও সরল ইংরেজী-ভাষায় লিখিত ও সুপাঠ্য। ঐ পত্রগুলিতে তাঁহার প্রাণের পরিচয়, তাঁহার বন্ধুবৎসলতা, উদারতা, অমায়িকতা, স্বদেশপ্রীতি, সাহিত্যানুরাগ ও কাব্যপ্রীতি (যাহা ঘোরতর দারিদ্র্যেও কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই)—এক কথায়, মধুসূদনের হৃদয় ও প্রাণবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার পত্রগুলি তাঁহার জীবনী-কথার অলঙ্কার-স্বরূপ। কাব্যাদির মধ্যে যেমন "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী"তে, তেমনি ঐ পত্রগুলির মধ্যেই মধুসূদন-ব্যক্তিটী অর্থাৎ তাঁহার প্রকৃত প্রাণটী ধরা দিয়াছে। সুতরাং প্রকৃত মধুসূদনকে জানিতে হইলে, তাঁহার ঐ-সব কবিতা ও পত্রগুলি মন দিয়া পড়া আবশ্যক।

গৌরদাস, মধুসূদনকে দেশে ফিরিতেও যেমন বারংবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেন, তেমনি তাঁহার রচিত ইংরেজী-কবিতাগুলি পড়িয়া প্রীত হইলেও মাতৃভাষায় তাঁহার উজ্জ্বল কাব্যপ্রতিভা প্রতিফলিত করিবার জন্যও অনুরোধ করিতে ত্রুটী করিতেন না। এমন সময়ে, একটী ঘটনায় মধুসূদনের চৈতন্যোদয় হইল। মধুসূদন, গৌরদাসের হাত দিয়া বেথুন সাহেবকে একখানি *Captive Ladie* উপহার দিয়াছিলেন। বেথুন সাহেব তখন বাঙ্গালা-গভরমেণ্টের অন্যতম সচিব ও শিক্ষা-বিধান-সমিতির সভাপতি। তিনি উপহার-খানি পাইয়া গৌরদাসকে যাহা লিখিয়াছিলেন,—গৌরদাস তাহা মধুসূদনকে জানাইয়াছিলেন।—

"His advice is the best you can adopt. It is an advice that I have always given you and will din into your ears all my life. The taste and talents you have cultivated would redound much to the honour and advantage to your country, if you will employ them in improving the standard and adding to the stock of your own language, if poetry at all events you must write. We do not want another Byron or another Shelly in English what we lack is a Byron or a Shelly in Bengali literature "*

'বাঙ্গালা-সাহিত্যের শুভাদৃষ্টে যিনি এই নব যুগের প্রবর্ত্তক হইবেন বেথুন সাহেবের উপদেশে ও বন্ধুবর গৌরদাসের অনুরোধে তাঁহার মতি-গতি ফিরিল। ঐ সময়ে তাঁহার এক পত্রে তিনি গৌরদাসকে লেখেন—

"I say, old Gour Dass Bysack ! can't you send me a copy of the Bengali translation of the Mahabharat by Cossiram Dass, as well as a ditto of the Ramayan—Serampore edition ? I am losing my Bengali faster than I can mention.'

ইহা হইতে মধুসূদনের মনের গতি কোন দিকে ফিরিতেছিল, তাহার আভাস পাওয়া যায়। গৌরদাসকে লিখিত আর-একখানি পত্রেও ঐরূপ আর-একটু ইঙ্গিত আছে।—

"Perhaps you do not know that I devote several hours daily to Tamil. My life is more busy than that of a schoolboy. Here is my routine ; 6-8 8 Hebrew, 8-12 School, 12 2 Greek, 2-5 Telegu and Sanskrit, 5-7 Latin, 7-10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers ?"

মধুসূদন মাদ্রাজে যাইবার তিন বৎসর পরে শোকাতুরা জননী প্রাণত্যাগ করেন। পরে, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতা পরলোক-গত হইলে, পৈতৃক সম্পত্তি হস্তগত করিবার জন্য গৌরদাস মধুসূদনকে দেশে ফিরিয়া আসিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে

* উদ্ধৃতাংশ বেথুন সাহেবের পত্র হইতে।

থাকিলেন। কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তি এমন বেশী নয় ভাবিয়া, মধুসূদন বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিতে এক-প্রকার অনিচ্ছুকই ছিলেন। পরে, কে জানে, কি ভাবিয়া, তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের আরম্ভে মধুসূদন হঠাৎ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। বন্ধুবৎসল মধুসূদনকে পাইয়া বন্ধু-বান্ধবেরা যার-পর-নাই আনন্দিত হইলেন। কেবল আনন্দিত হইতে পাইলেন না, তাঁহার জনক-জননী! মধুসূদনের দুর্ভাগ্য!

বন্ধু-বান্ধবগণ মধুসূদনকে কলিকাতায় স্থায়ী করিবার জন্য একটী চাকরী স্থির করিলেন—পুলিশ-কোর্টের হেড্ ক্লার্কগিরি। বন্ধুদিগের অনুরোধে মধুসূদন তাহাতেই সম্মত হইলেন। কিছুকাল পরে, ঐ পুলিশ-কোর্টেই তিনি বহুভাষীর (interpreter) পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত—H. H. Wilson-প্রমুখ নাট্যানুরাগী অনেকগুলি উচ্চপদস্থ ইংরেজের চেষ্টায় কলিকাতার ইংরেজ-মহলে ঘন-ঘন নাট্যাভিনয় হইতে থাকিলে, দেশীয় রঙ্গালয়ের অভাবে, তাৎকালিক শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ ইংরেজী থিয়েটারে গিয়া নাট্যামোদ উপভোগ করিতে-করিতে নাট্যানুরাগী হইয়া পড়িলেন। অন্তরে অনুরাগ জন্মিলে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে বেশী সময় লাগে না। অবিলম্বে জনৈক ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটী সামান্য রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হইলে, তাহাতে "বিদ্যাসুন্দর" নাটক অভিনীত হইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনস্তৃপ্তি হইল না। বিশেষতঃ, এক বিদ্যাসুন্দর-নাটক উপর্য্যুপরি কয়বারই বা ভাল লাগিতে পারে? এই সময়ে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব"-নাটক অন্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া সকলেরই আনন্দোৎপাদন করিয়াছিল। পরে আশুতোষ দেবের বাড়ীতে "শকুন্তলা" এবং কালী প্রসন্ন সিংহের বাড়ীতে "বেণীসংহার" ও "বিক্রমোর্ব্বশী"* অভিনীত হইলে, পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও রাজা প্রতাপচন্দ্র এবং যতীন্দ্র মোহন (পরে স্যার মহারাজা নাট্যানুরাগী হইয়া পড়িলেন। তাহারই ফলে, বেলগাছিয়া-উদ্যানে একটী অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হইল এবং আমুই-

* তিনখানি নাটকই সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদ।

যন্ত্রিক-প্রয়োজন-হিসাবে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর অধিনায়কত্বে একটী ঐক্যতান-বাদকের দলও সংগঠিত হইল। এখন, অভিনয়ের জন্য চাই একখানি নূতন নাটক। "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" ও "শকুন্তলা" নাটকে রামনারায়ণ তখন যশস্বী—এমন কি, তিনি "নাটুকে রামায়ণ" বলিয়া লোকসমাজে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারই উপরে একখানি নূতন নাটক লিখিবার ভার অর্পিত হইলে, তিনি শ্রীহর্ষ-প্রণীত সংস্কৃত-নাটিকা অবলম্বনে বাঙ্গালায় "রত্নাবলী" নাটক লিখিলেন। মহাসমারোহে নাটকাভিনয়ের উদ্যোগ। সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ছাড়া, কলিকাতার উচ্চপদস্থ ইংরেজ-সম্প্রদায়ও এই অভিনয়-দর্শনে নিমন্ত্রিত হইবেন। সুতরাং তাঁহাদিগের জন্য ঐ নাটকের যথাযথ ইংরেজী অনুবাদ আবশ্যক হইল এবং মধুসূদনই এই কার্য্যের উপযুক্ত বোধে তাঁহারই উপর অনুবাদের ভার পড়িল। মধুসূদন যেমন ইংরেজী ভাষায় সুদক্ষ, ইংরেজী রচনা করিতেও তেমনই ক্ষিপ্রহস্ত। শীঘ্রই অনুবাদ সম্পন্ন হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া গেল।

এই সময়ে একদিন অভিনয়-অভ্যাস (Rehearsal) কালে অন্যান্য দর্শকদিগের মধ্যে গৌরদাস ও মধুসূদনও উপস্থিত ছিলেন। কথায়-কথায় মধুসূদন গৌরদাসকে বলিলেন যে, রাজারা এই অকিঞ্চিৎকর নাটকখানির অভিনয়ের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতেছেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। গৌরদাস বলিলেন,—"ইহা অপেক্ষা ভাল নাটক আছেই বা কৈ ? আর লেখেই বা কে ?" তখন মধুসূদনের মুখ দিয়া বাহির হইল (অথবা যেন কোন অদৃশ্য শক্তি মধুসূদনকে দিয়া বলাইল)—"কেন আমিই লিখিতে পারি"। বোধ হয়, অনুবাদ করিবার সময়েই বাঙ্গালা রত্নাবলী-নাটকখানি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মধুসূদনের ধারণা হইয়াছিল। তাই, যখন গৌরদাস "কে লিখিবে" বলিয়া একটা আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন, তখন মধুসূদন নিজেই লিখিবেন, এইরূপ উক্তি না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। মধুসূদন "বাঙ্গালা নাটক" লিখিবেন, গৌরদাস বোধ হয়, এ কথা মোটেই গম্ভীর-ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই ;—হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু মধুসূদন নিজের অন্তরস্থ সুপ্ত সারস্বত শক্তির প্রভাবেই ঐরূপ গর্ব্বোক্তি করিয়াছিলেন, গৌরদাস তাহা বুঝেন

নাই। গৌরদাস বুঝিলেন, যখন এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই মধুসূদন "শর্ম্মিষ্ঠা"-নাটকের প্রথম অঙ্ক রচনা করিয়া উহার হস্তলিপি গৌরদাসের হস্তে দিলেন। উহা পড়িয়া গৌরদাস শুধু খুসী নয়, একেবারে বিস্মিত! তিনি আরও দুই চারি জনকে দেখাইলে, তাঁহারা সকলেই আনন্দিত ও অবাক্ হইয়া গেলেন! এইরূপে উৎসাহিত হইয়া মধুসূদন নাটকখানি শীঘ্রই সম্পূর্ণ করিয়া রাজাদের হস্তে প্রদান করিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই নাটকখানি সম্বন্ধে পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন যে, সে সময়ে যে-কয়খানি বাঙ্গালা নাটক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে "শর্ম্মিষ্ঠা''-নাটকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই নাটকখানিও মহাসমারোহে অভিনীত হইবে বলিয়া, রাজাদের অনুরোধে মধুসূদনকে ইহারও ইংরেজী অনুবাদ করিতে হইয়াছিল। এই অনুবাদ এমন সুন্দর যে, জনৈক ইংরেজ এই অনুবাদ পড়িয়া ইহাকেই মূল-গ্রন্থ ভাবিয়াছিলেন।

শর্ম্মিষ্ঠার ইংরেজী অনুবাদ করিতে-করিতে মধুসূদন আর-একখানি বাঙ্গালা নাটক রচনা করিতে লাগিলেন। ইহাই "পদ্মাবতী"-নাটক—গ্রীক-পুরাণের Disco r-dia-কাহিনী-অবলম্বনে লিখিত। এই সময়ে তিনি তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, —"Now that I have got the taste of blood, I am at it again." ব্যাঘ্র-শাবক রক্তের আস্বাদ পাইয়াছে, আর কি ছাড়িতে পারে? সাহিত্য-প্রতিভা প্রকটনে মাতৃভাষা ছাড়া আর কি আছে? একখানি বাঙ্গালা-নাটক লিখিয়াই প্রতিভাশালী মধুসূদনের মাতৃভাষার নেশা ধরিয়া গেল!

নাটক-অভিনয়ের পরে প্রহসন-অভিনয় হইলে আরও উপাদেয় হয় ভাবিয়া, রাজারা মধুসূদনকে প্রহসন লিখিতেও অনুরোধ করেন। এই অনুরোধে মধুসূদন উপর্য্যুপরি দুইখানি প্রহসন লিখিয়া ফেলিলেন—"একেই কি বলে সভ্যতা?" ও "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" * এই প্রহসন দুইখানি যেমন শীঘ্র লেখা হইল, তেমনি শীঘ্র মুদ্রিত হইয়া গেল। কিন্তু ঐ থিয়েটারে অভিনীত হইল না। কারণ, প্রথম

* মধুসূদন শেষোক্ত প্রহসন খানির নাম রাখিয়াছিলেন, "ভগ্ন শিবমন্দির"। পরে যতীন্দ্রমোহন উপরি-উক্ত নাম রাখিতে বলায় মধুসূদন তাহাই করেন।

খানিতে নব্য ইঙ্গ-বঙ্গ বাবুদের কেহ-কেহ চটিতে পারেন, আর দ্বিতীয় খানি অভিনীত হইলে গোঁড়া হিন্দু-দলের কেহ-কেহ দুঃখিত হইতে পারেন; অথচ রাজারা কাহাকেও চটাইতে চাহেন না। অভিনীত হইবেনা শুনিয়া মধুসূদন দুঃখিত হইয়া রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন—"I half regret having published those two things." কিন্তু সাহিত্যের পক্ষ হইতে বলিতে গেলে প্রহসনদ্বয় প্রকাশিত হইয়া ভালই হইয়াছে। কারণ, আজ পর্য্যন্ত ঐ দুইখানি প্রহসনই প্রহসন-সাহিত্যে যুগল-রত্ন-স্বরূপ। ইহাদের সমকক্ষ হইতে পারে, এরূপ প্রহসন বাঙ্গালায় এখনও বাহির হয় নাই। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রহসন দুইখানি প্রকাশিত হয়। "পদ্মাবতী"—পূর্ব্বের রচিত হইলেও, প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পদ্মাবতীর প্রথম প্রকাশ।

নাটক-রচনায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন করা মধুসূদনের একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু প্রথমে তিনি সাহসী হন নাই। শর্ম্মিষ্ঠা-নাটক রচনার পরে, একদিন যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে কথোপকথনে এই প্রসঙ্গ উঠিল। বাঙ্গালা-ভাষা অমিত্রচ্ছন্দের উপযোগী নয়, যতীন্দ্রমোহন এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন। মধুসূদন কিন্তু দৃঢ়ভাবে উত্তর দিলেন—"সংস্কৃত-জননীর দুহিতা বাঙ্গালা-ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের চলন কখনই অসম্ভব নহে।" উত্তরে যতীন্দ্রমোহন বলিলেন,—"আচ্ছা আপনি লিখুন। তাহা মুদ্রণের ব্যয়-ভার আমি বহন করিব।" ইহার পরে পদ্মাবতী-রচনা-কালে তিনি যেন অতি সন্তর্পণে উহাতে স্বল্প-মাত্রায় অমিত্রচ্ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার পরে, প্রহসন দুইখানি সমাপ্ত করিয়াই, তিনি সাহসে ভর করিয়া আগাগোড়া অমিত্রচ্ছন্দে একখানি কাব্য লিখিতে যত্নবান্ হইলেন। "তিলোত্তমা-সম্ভব" কাব্যের প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ লিখিয়াই তিনি যতীন্দ্রমোহনকে দেখাইলেন। মধুসূদন বাঙ্গালার অকস্মাৎ শর্ম্মিষ্ঠা-নাটক লিখিলে, তাঁহার বন্ধুগণ যেমন চমৎকৃত হইয়াছিলেন, অমিত্রচ্ছন্দে এই তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ পড়িয়া তাঁহারা ততোধিক চমৎকৃত হইলেন। বন্ধুদিগের কাছে উৎসাহ পাইয়া, মধুসূদন তাঁহার স্বাভাবিক ক্ষিপ্রহস্তে আরও দুই সর্গ লিখিয়া, সমগ্র কাব্যের হস্তলিপিখানি যতীন্দ্রমোহনের হস্তে প্রদান করিলে, যতীন্দ্রমোহন সাদরে উহা গ্রহণ করিয়া আজীবন উহাকে মহারত্ন-জ্ঞানে

সংরক্ষণ করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে উহাকে Victoria Memorial-এর জন্য উপহার-স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ এখন ঐ হস্তলিপি ভিক্টোরিয়া-হলে বিদ্যমান্। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মে-মাসে "তিলোত্তমা-সম্ভব" পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

"তিলোত্তমা-সম্ভব" রচনা সমাপ্ত করিয়া মধুসূদন, বোধ হয়, যেন একটু হাত বদ্‌লাইয়া লইবার জন্য, "ব্রজাঙ্গনা"-নামক ক্ষুদ্র একখানি গীতিকাব্য রচনা করেন। এই সময়ে তাঁহার এক বন্ধু (বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত) মধুসূদনের মুখে উহার দুই-একটী কবিতার আবৃত্তি শুনিয়া মুগ্ধ হইলে, উদার-হৃদয় মধুসূদন তখনই ঐ গ্রন্থের স্বত্ব-সমেত হস্তলিপিখানি তাঁহার হস্তে দেন। ব্রজাঙ্গনা, মেঘনাদবধ-কাব্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে রচিত হইলেও, উহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতে বড়ই বিলম্ব হইয়াছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে উহা প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন মধুসূদনের মেঘনাদবধ-কাব্যের প্রথম খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া, দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ-সর্গ ছাপা হইতেছিল।

ব্রজাঙ্গনা ছাপিতে দিয়া মধুসূদন মেঘনাদবধ-রচনায় গভীর রূপে মনোনিবেশ করিলেন। পাঁচ সর্গ রচিত হইলেই, "মেঘনাদবধ—প্রথম খণ্ড" নামে উহা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

মেঘনাদবধ (প্রথম ভাগ) রচনার পরেই মধুসূদন তাৎকালিক নাট্যাচার্য্য কেশব চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পরামর্শে ও অনুরোধে কর্ণেল টড্-প্রণীত রাজস্থানের ইতিবৃত্তি হইতে "কৃষ্ণকুমারী"-নামক বিয়োগান্ত নাটক লিখেন। ঠিক এক মাসে উহার রচনা সম্পূর্ণ হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইহার পরেই মধুসূদন "মেঘনাদবধ—দ্বিতীয় খণ্ড" (ষষ্ঠ হইতে নবম সর্গ) লেখেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। এই দুই খণ্ডে মেঘনাদবধ-কাব্য সম্পূর্ণ। এই 'মেঘনাদবধ"ই নবযুগের কাব্য-সহিত্য-ক্ষেত্রে মধুসূদনের অক্ষয়-কীর্ত্তিস্তম্ভ-স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

ঐ বৎসরেই মধুসূদন নীলদর্পণ-নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করেন। কথিত

আছে,—একজন "নীলদর্পণ" পড়িতে লাগিলেন, আব সঙ্গে-সঙ্গে মধুসূদন উহার অনুবাদ করিতে থাকিলেন। এইরূপে এক রাত্রিতেই অনুবাদ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

ঐ বৎসরেই সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুরের অনুরোধে মধুসূদন "আত্মবিলাপ" শীর্ষক একটী ক্ষুদ্র কবিতা (*) লেখেন। উহা আশ্বিনের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটী মানব-জীবনেব অনুতাপাত্মক এবং ক্ষুদ্রকায় হইলেও অমরতাব অধিকারী।

ঐ বৎসরেই মধুসূদন বোমক-কবি ওভিদেব Heroic Epistles নামক পত্র-কাব্যেব আদর্শে কয়েকটী হিন্দু পৌবাণিক পাত্রীব ভূমিকায় এগার খানি পত্রিকা লেখেন। প্রত্যেক পত্রিকাখানি এক-এক পৌবাণিক নাবী কর্তৃক উপযুক্ত অবসবে স্বীয় স্বামী বা প্রণয়-পাত্রকে লিখিত। মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দের মাধুর্য্য এই কাব্যে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেক পত্রিকাই উপাদেয় কবিত্বে মণ্ডিত এবং বিষয়-বৈচিত্র্য-হেতু রস-বৈচিত্র্যে কাব্যখানি আদ্যন্ত সুখপাঠ্য।

মধুসূদন কিঞ্চিদধিক তিন বৎসব কাল মাত্র বঙ্গসাহিত্যে ব্রতী হইয়া তিনখানি নাটক, দুইখানি প্রহসন, দুইখানি কাব্য, একখানি পত্রিকা কাব্য ও একখানি গীতিকাব্য বচনা করিলেন। ইহা ছাড়া ঐ সময়ের মধ্যে তিনি তিনখানি বাঙ্গালা নাটকের ইংবেজী অনুবাদও করেন। তাঁহাব লিখিত পত্রগুলি হইতে জানা যায যে, বীরাঙ্গনা-কাব্যের দ্বিতীয় ভাগ (আরও দশখানি পত্রিকা), ব্রজাঙ্গনা-কাব্যেব "বিহার" নামক আরও এক সর্গ, "সিংহল-বিজয়," "পাণ্ডব-বিজয় ও "ভাবত-বৃত্তান্ত" কাব্যত্রয়, ইত্যাদি কত কি লিখিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। অধিকাংশগুলিতে তিনি হাতও দিয়াছিলেন; কিন্তু মনশ্চাঞ্চল্যে কোন খানিতেই বেশী অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এই সময়ে বিলাত-যাত্রার ইচ্ছা তাঁহাকে বিষম ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি রাজনারায়ণকে লিখিলেন,—"But I suppose my poetical career is drawing to a close. I am making arrangements to go to England to study for the Bar and must bid adieu to the Muse."

---

* "আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়।"—ইত্যাদি।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের প্রারম্ভে মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখিলেন— "Well, -I am off, my dear Rajnarain! Heaven alone knows if we are to see each other again! But you must not forget your friend. It is a long separation—four years! But what is to be done? Remember your friend and take care of his fame

Being a poetaster, I would not think of bolting away without rhyming, and I enclose the result—and I hope the thing is—if not good—at least respectable."

বঙ্গভূমির প্রতি

সোনাই, সন ১২৬৯ সাল, খৃষ্টাব্দ ১৮৬২

"My native land, Good night!"—(*Byron.*)

রেখো, মা, দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে।

সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না, গো, তব মনঃ-কোকনদে!

প্রবাসে দৈবের বশে, জীব-তারা যদি খসে,
এ দেহ-আকাশ হ'তে,—নাহি খেদ তা'হে।

জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,—
চিরস্থির কবে নীর,—হায় রে, জীবন-নদে?

কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি, মা, ডরি শমনে—
মক্ষিকাও গলে না, গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে!

সেই ধন্য নর-কুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।

কিন্তু কোন্ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে?

তবে যদি কৃপা কর, ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!—

ফুটি যেন স্মৃতি-জলে, মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস—কি বসন্ত, কি শরদে!

অমরতা-প্রয়াসী কবির পক্ষে সুদূর বিদেশ-গমনের সময়ে স্বদেশের প্রতি কি করুণ নিবেদন! তিনি বরাবরই আত্মপ্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ সজ্ঞান ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যে বাঙ্গলা-সাহিত্যে তিনি যাহা করিয়া চলিলেন, তাহাতে অমরতার দাবী করায় তাঁহাকে কোনমতেই নিন্দা করা যায় না। এই বিদায়-গীতটী বিদেশে যাইবার সময়ে লিখিত হইলেও, ইহার করুণ সুরটী এখন যেন পাঠককে তাঁহার চির-বিদায়ই স্মরণ করাইয়া দেয়; মনে হয়, যেন বঙ্গভূমি হইতে চিরবিদায়-কালে মধুসূদনের প্রাণ বলিতে চাহিয়াছিল,—

"মধুহীন করো না, গো, তব মনঃ-কোকনদে।"

তারপর, আজ পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর তাঁহার মৃত্যু-দিনে তাঁহার সমাধিস্থলে যখন বঙ্গ-সন্তানগণ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন, তখনও যেন মনে হয়, বঙ্গভূমির ক্রোড়স্থ চির-নিদ্রিত মধুসূদনের আত্মা কাতর কণ্ঠে নিবেদন করিতেছে,—"মধুহীন করো না, গো, তব মনঃ-কোকনদে।" তাঁহার এই বিদায়-কবিতাটীও অমরত্বের দাবী করিতে পারে।

মধুসূদন বিলাত-যাত্রা করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার পত্নীও পুত্র-কন্যাসহ বিলাতে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এদিকে নিজ পৈতৃক সম্পত্তি হইতে নিয়মিত-রূপে অর্থপ্রাপ্তির যে ব্যবস্থা মধুসূদন করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে সে বিষয়ে নানা গোলযোগ ঘটিল। বিলাতের মত স্থানে সপরিবারে থাকা সবিশেষ ব্যয়-সাধ্য; অথচ টাকা আসিতে থাকিল না। মধুসূদন বিব্রত হইয়া পড়িলেন এবং আইন পড়া কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিয়া অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়-সাধ্য ফ্রান্স দেশে Versailles-নগরে কোনরূপে দিনপাত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নিজের বিপদের কথা জানাইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও মধুসূদনের অবস্থা বুঝিয়া যথা-কর্ত্তব্য সহায়তা করেন। নতুবা ইউরোপের মত স্থানে অর্থহীন মধুসূদনের যে কি দুর্দ্দশা হইত, তাহা ভাবিতেও পারা যায় না। মধুসূদনের তখনকার সাংসারিক অবস্থা ত এই; কিন্তু এমনই তিনি কাব্য-প্রাণ যে, এই দুরবস্থার

সময়েও ভিন্ন-ভিন্ন ভাষা-শিক্ষা ও কাব্য-চর্চ্চায় তাঁহার বিরাম ছিল না। এই সময়েই তিনি জার্ম্মাণ ভাষা ও ইতালীয় ভাষা শিক্ষা করিতেছিলেন। ফরাসী ভাষায় কখন-কখন কবিতা লিখিয়া তিনি কিছু কবিত্ব-যশও পাইয়াছিলেন।

এই ভার্সেল্‌স্‌-নগরে অবস্থান-কালে তিনি "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" রচনা করেন। এদেশে থাকিতে তিনি এক সময়ে "কবি মাতৃভাষা" * শীর্ষক একটী চতুর্দ্দশপদী কবিতা লিখিয়া বন্ধু রাজনারায়ণকে উপহার দেন। তখন এই পর্য্যন্ত। পরে, প্রবাসে বসিয়া নানা বিষয় অবলম্বনে তিনি একশত চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী লিখিলেন এবং উপক্রমণিকা-স্বরূপ আরও দুইটী কবিতা,—এই একশো-দুইটী কবিতায় চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী সম্পূর্ণ করিলেন। তিনি প্রবাসে থাকিতে আর যাহা-যাহা লিখিয়াছিলেন, সে সকলই অসম্পূর্ণ। তিলোত্তমা-সম্ভবের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রায় ছত্রে-ছত্রে পরিবর্ত্তন করিয়াও তাঁহার মনস্তৃপ্তি হয় নাই। এইখানে তিনি তিলোত্তমা-সম্ভব পুনর্লিখনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম সর্গের কতকটা লিখিয়াই ক্ষান্ত হয়েন। সুভদ্রা-হরণের কিঞ্চিদংশ, দ্রৌপদী-স্বয়ম্বরের কিঞ্চিদংশ, এইখানে বসিয়া লিখিত। La-Fontaine প্রণীত নীতিগর্ভ কবিতাবলী পড়িয়া তিনি আদর্শ-স্বরূপ তিনটী মাত্র নীতি-গর্ভ কবিতা + এই সময়েই লেখেন। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর হস্তলিপির সঙ্গে তিনি এই সব কবিতাবলীও কলিকাতায় তাঁহার গ্রন্থ-প্রকাশক ঈশ্বরচন্দ্র বসুর নিকট পাঠাইয়া দিলে "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" প্রকাশিত হইল। উহার পরিশিষ্টে ছিল—পুনর্লিখিত তিলোত্তমা-সম্ভবের অংশটুকু, পূর্ব্বোক্ত তিনটী নীতিগর্ভ কবিতাবলী ও সুভদ্রা-হরণের আরম্ভাংশ। ভার্সেল্‌স্‌ নগরে লিখিত এই চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীই মধুসূদনের নির্ব্বাণোন্মুখী কাব্য-প্রতিভার শেষ-শিখা। চতুর্দ্দশপদীর শেষ-কবিতাটীর নাম—"সমাপ্তে"।—

---

* "নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন" ইত্যাদি।

* রসাল ও স্বর্ণ-লতিকা, কাক ও শৃগালী এবং ময়ূর ও গৌরী।

"বিসর্জ্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে
(হৃদয়-মণ্ডপ হায়, অন্ধকার করি)
ও প্রতিমা। * *
* নারিনু মা চিনিতে তোমারে—
শৈশবে, অবোধ আমি! ডাকিলা যৌবনে;
(যদিও অধম পুত্র মা কি ভুলে তারে?)
এবে—ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে!
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ ভারত-রতনে!"

তিনি কাব্যের 'ইন্দ্রপ্রস্থ' পরিত্যাগ করিয়া আইন-ব্যবসায়ের গহন বনে প্রবেশ করিতে উদ্যত। তাই, হৃদয়-মণ্ডপ হইতে কবিতা-দেবীকে বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইলেন।

এই সময়ে লিখিত মধুসূদনের একখানি পত্র হইতে একটু উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করিতেছি। চতুর্দ্দশপদী কবিতা লিখিবার সময় বন্ধুগণের মতামত জানিবার জন্য দুই তিনটী কবিতা তিনি গৌরদাসকে পাঠাইয়াছিলেন। সেই পত্রে প্রসঙ্গতঃ তিনি বাঙ্গলা ভাষা ও উহার অনুশীলন সম্বন্ধে যে কয়টী কথা লিখিয়াছিলেন, তাহা আজিও আমাদের অনেকের, বিশেষতঃ ছাত্রবৃন্দের জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"Believe me, my dear friend, our Bengali is a very beautiful language. It only wants men of genius to polish it up; such of us as, owing to early defective education, know little of it and have learnt to despise it, are miserably wrong. It is or rather it has the elements of a great language in it. I wish I could devote myself to its cultivation; but, as you know, I have not sufficient means to lead a literary life and do nothing in the shape of real work for a living."

তিনি যে কেবল ব্যারিষ্টার হইবার জন্যই বিলাত গিয়াছিলেন, তাহা নহে। সেখানে ইউরোপের উৎকৃষ্ট ভাষা-সকল ভাল করিয়া শিক্ষা করাও তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এবং তিনি ইংলণ্ডে না থাকিয়া সপরিবারে ফ্রান্স দেশে ভার্সেল্‌স্-

নগরে অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন, ঐ উদ্দেশ্যই তাহার অন্যতম কারণ। ইউরোপ-প্রবাসকালে তিনি যেরূপ আর্থিক ক্লেশ পাইয়াছিলেন, তাহা মনে করিলেও কষ্ট হয়। অনেক সময়ে সপরিবারে অনাহার-ভীতি বা দেনার দায়ে জেলে যাইবার আশঙ্কা তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তবু কিন্তু এমন দুর্দ্দিনেও সাহিত্য-চর্চ্চায় তাঁহার অসাধারণ আকাঙ্খা ও আগ্রহের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। ঐ সময়ে লিখিত তাঁহার এক পত্রে আছে ঃ—

"Though I have been very unhappy and full of anxiety here, I have very nearly mastered French. I speak it well and write it better. I have also commenced Italian and mean to add German to my stock of knowledge, —if not Spanish and Portugese, before I leave Europe."

সাহিত্য-চর্চ্চায় এই-যে আগ্রহ ও আনন্দ, ইহা অপূর্ব্ব। মধুসূদন এই আনন্দে বিভোর ছিলেন। কিন্তু ইহা শুধু যে নিজের জন্য, তাহা নহে। নানা দেশের নানা রত্ন সংগ্রহ করিয়া মাতৃভাষাকে উজ্জ্বল করিবেন, ইহাই তাঁহার নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বন্ধুবর গৌরদাসকে যাহা লিখিয়াছিলেন, সে কথা এখনও আমাদের সকলেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"I have been for months like a ship becalmed in France, though, thank God, I have had strength of mind and resolution to make the very best use of my misfortune in learning the three great continental languages, viz Italian, German and French languages—which are well worth knowing for their literary wealth. You know, my Gour, that the knowledge of a great European language is like the acquisition of a vast and well-cultivated state—intellectual of course. Should I live to return, I hope to familiarise my educated friends with these languages through the medium of our own. After all, there is nothing like cultivating and enriching our own tongue. Do you think England, or France, or Germany, or Italy wants Poets and Essayists? I pray God, that the noble ambition of Milton to do something for his mother-tongue and his native land may animate all men of talent among us. If there be any one among us anxious to leave a name behind him, and not pass away into oblivion like a brute, let him devote himself to his mother tongue. That is his legitimate

sphere—his proper element. European scholarship is good, in as much as it renders us masters of the intellectual resources of the most civilised quarters of the globe ; but when we speak to the world, let us speak in our own language. Let those who feel that they have springs of fresh thought in them, fly to their mother tongue. Here is a bit of 'lecture' for you and the gents who fancy that they are swarthy Macaulays and Carlyles and Thackerays ! I assure you, they are nothing of the sort. I should scorn the pretensions of that man to be called "educated" who is not master of his own language"

এতকাল পরে, এখনও ঐ "লেকচারটী" এদেশেব "শিক্ষিত"দিগকে শুনাইবার প্রয়োজন আছে—দুঃখের সহিত এ কথা বলিতে হইল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃপায় মধুসূদনের অর্থ-কষ্ট দূর হইলে, তিনি ইংলণ্ডে আইন পড়িয়া ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের প্রাবম্ভে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে প্রবিষ্ট হইতে তাঁহাকে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর-প্রমুখ অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের সহায়তায়—তিনি অবশেষে কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার-রূপে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

তিনি দুই বৎসর-মাত্র ব্যারিষ্টারী করেন। তাহাতে যথাসম্ভব যে অর্থ পাইতেন, তাঁহার মত অমিতব্যয়ী লোকের পক্ষে তাহাতে কুলাইত না। ক্রমে পসার-প্রতিপত্তির একটু হ্রাস হইতে থাকিলে, তিনি ঐ হাইকোর্টেই মাসিক একহাজার টাকা বেতনে একটী চাকুরী স্বীকার করিয়া, আর দুই বৎসর কাটাইলেন। কিন্তু অমিতচারী ও অমিতব্যয়ী মধুসূদনের সংসারে ইহাতেও স্বচ্ছলতা বিরাজ করিতে পাইল না। ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল। এই সময়ে তিনি অল্পদিন পঞ্চকোটের রাজার অধীনে চাকুরী করেন। ক্রমে তিনি রোগে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তাঁহার দারিদ্র্য চরমে উঠিয়াছিল। অর্থের জন্য গৃহের মূল্যবান্ দ্রব্যাদি, কখনও বিক্রয় করিতে হইত, কখনও বা দেনার দায়ে নিলাম হইত।

বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পরে তাঁহার সাহিত্য প্রচেষ্টা নিতান্তই স্বল্প ও ক্ষীণ। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কয়েক মাস পীড়িত থাকেন। এই সময়ে গ্রীক্-ভাষায়

"ঈলিয়াস" কাব্য পড়িয়া তিনি চিত্ত-বিনোদন করিতেন। ইহারই ফলে, "হেক্টার-বধ" অথবা গ্রীক্-ভাষার ঈলিয়াস-নামক মহাকাব্যের উপাখ্যান ভাগ। ইহা গদ্য-গ্রন্থ। সুদীর্ঘ গদ্য-রচনায় মধুসূদন অভ্যস্ত ছিলেন না। সুতরাং এই গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য হয় নাই। গ্রন্থখানি চারি বৎসর মুদ্রাযন্ত্রের কবলে থাকিয়া ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার পরে তিনি Æsop's Fables-এর আদর্শে কয়েকটী নীতিগর্ভ কবিতা লেখেন। সেগুলি আজিও ঐ শ্রেণীর কবিতার আদর্শ বলিলেও হয়। পরে, রোগে শয্যাগত অবস্থায় বঙ্গ-রঙ্গভূমি (বেঙ্গল থিয়েটার) হইতে কিছু অর্থ-সাহায্য পাইয়া, তিনি "মায়া-কানন" ও "বিষ না ধনুর্গুণ" নামে দুই খানি নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কোনখানিই সমাপ্ত করিতে পারেন নাই।

ক্রমে কপর্দ্দকহীন হইয়া কিছুদিন তাঁহাকে পরাশ্রয় গ্রহণ করিতেও হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার পত্নীও পীড়িতা হইয়া পড়িলেন। অবশেষে মধুসূদন কলিকাতা জেনারেল্ হাসপাতালে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়েন। সেখানে দিন দিন তাঁহার অবস্থা মন্দ হইতে থাকিল। এমন সময়ে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়। হাসপাতালে থাকার সময়ে মধুসূদন নিরন্তর নিজের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য গভীর অনুতাপ করিতেন। পত্নী-বিয়োগের তিন দিন পরে হাসপাতালেই মধুসূদনের প্রাণবায়ু বহির্গত হয় - সেদিন রবিবার,—২৯শে জুন, ১৮৭৩।

বহুকাল ধরিয়া মধুসূদনের সমাধি অচিহ্নিত অবস্থাতেই ছিল। ক্রমে সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া প্রায় ১৫ বৎসর পরে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বরে— মধুসূদনের সমাধির উপর প্রস্তর-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ স্তম্ভের গাত্রে মধুসূদনের মুমূর্ষু কালে স্ব-রচিত সমাধি-লিপি-টুকু * উৎকীর্ণ আছে—

---

* যাঁহারা মহাকবি সেক্সপিয়রের স্ব-রচিত সমাধি-লিপির সংবাদ রাখেন, তাঁহারা দেখিবেন, এই সমাধি-লিপির আরম্ভ তাহারই আদর্শে—"Stay, Passenger, why goest thou by so fast" ইত্যাদি।

"দাঁড়াও, পথিক-বর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে ! তিষ্ঠ ক্ষণকাল ! এ সমাধি-স্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর কোলে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত-কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন !
যশোরে সাগর-দাঁড়ী কবতক্ষ-তীরে
জন্মভূমি ; জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে ; জননী জাহ্নবী!" (মাইকেল মধুসূদন দত্ত।)

ইহার পর হইতে প্রতি বৎসর ২৯শে জুন কবির সমাধির উপরে বহু সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি কর্ত্তৃক পুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। গত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতাব নানাস্থানে কবির জন্মদিনের শতবার্ষিক উৎসবও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

মেঘনাদ-বধ কাব্য

প্রকাশ ও সমাদর

ভারতচন্দ্রীয় যুগের শেষ-কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের চিতাধূম বঙ্গ-সাহিত্যাকাশে বিলীন হইতে-না-হইতে "বিবিধার্থ সংগ্রহে" মধুসূদনের তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য প্রকাশিত হইতে থাকিল। ইহা শুধু এক কবির অন্তে আর-এক কবির উদয় নহে—ইহা বাঙ্গালা-সাহিত্যের "প্রাচীন" যুগের অবসানে নবযুগের অভ্যুত্থান। বাঙ্গালা-সাহিত্যের আলোচনায় এ কথাটি বুঝিয়া রাখা একান্তই কর্ত্তব্য। ধারা-ভেদে যুগ-ভেদ হয়। প্রাচীন যুগের বাঙ্গালা-সাহিত্যের ধারা ছিল ধর্ম্ম-সাহিত্যের ধারা। ক্ষুদ্র কবিতাদির কথা বলিতেছি না। কাব্য বা মহাকাব্যই ধারা নির্দ্দেশ করে। অবান্তর ধারা ও অন্তর্যুগ সমেত বাঙ্গালার যে প্রাচীন যুগ, তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন-সাহিত্যের, যাহাকে ইংরেজীতে Pure Literature বলে, তাহার একান্ত অভাব ছিল। এমন কি, ভারতচন্দ্রের Romantic কাব্য "বিদ্যাসুন্দর", তাহাও ধর্ম্মের সহিত বিজড়িত ও দেবী-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে সমাপ্ত। এই ভারতচন্দ্রীয় যুগ বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রাচীন যুগের শেষ অন্তর্যুগ; এবং দাশরথি রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন এই যুগের শেষ কবি। সংস্কৃতে নিরবচ্ছিন্ন-সাহিত্যের অভাব নাই। কিন্তু বাঙ্গালায় উহা ছিল না, বলিলেই হয়। মধুসূদনের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে সংস্কৃত দুই-একখানি নাটকের বঙ্গানুবাদ হইতে তাৎকালিক শিক্ষিত সম্প্রদায় ঐ-জাতীয় সাহিত্যের আস্বাদ গ্রহণ করিতেছিলেন। তখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় নিরবচ্ছিন্ন-সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই। মধুসূদনের তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যই বাঙ্গালায় মৌলিক আকারে নিরবচ্ছিন্ন-সাহিত্যের প্রথম প্রকাশ। শুধু ইহাতেই নবযুগ সূচিত হইতে পারিত; কিন্তু এই সঙ্গে আরও-একটি বিশিষ্ট ধারা-ভেদ মিলিত হইয়া এই নবযুগের সাহিত্যকে সর্ব্বাংশে এক নূতন পথে চালিত করিয়াছে। আমি এখানে

পাশ্চাত্য প্রভাবের ইঙ্গিত করিতেছি। ঐ প্রভাবই এই নব যুগের বঙ্গ-সাহিত্যকে সম্পূর্ণ এক নূতন ধরণের বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে বাঙ্গালা-সাহিত্যে এই প্রভাব দিনদিন প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে। ইহাই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন ও নবযুগের বিশিষ্ট প্রভেদ এবং মধুসূদনই ইহার প্রবর্ত্তক। বাঙ্গালা-সাহিত্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনই ছিল মধুসূদনের একান্ত অভীপ্সিত কার্য্য এবং এই কার্য্য সাধনের জন্য তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন—"শরীরং বা পাতয়েয়ম্ কার্য্যং বা সাধয়েয়ম্"—হয় শরীর-পতন, নয় কার্য্য-সাধন। সেকালে তাঁহার গ্রন্থগুলির প্রচ্ছদপত্রে যে একটী সাঙ্কেতিক চিত্র থাকিত, তাহা এই সাধনারই দ্যোতক। একদিকে হস্তী, অপরদিকে সিংহ;—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সঙ্কেত। এই উভয়ের মধ্যস্থ কাব্য-প্রতিভারূপী সূর্য্য বঙ্গ-সাহিত্য-শতদলকে সমুদ্ভাসিত করিতেছে। মধুসূদনের সৌভাগ্য যে, তিনি বঙ্গ-সরস্বতীর কৃপায় সঙ্কল্পিত কার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন।

মেঘনাদবধ-কাব্য প্রথম-প্রথম দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইত। ১ম সর্গ হইতে ৫ম সর্গের শেষ পর্য্যন্ত প্রথম খণ্ড; ৬ষ্ঠ হইতে ৯ম সর্গ, দ্বিতীয় খণ্ড। ১২৬৭ সাল ২২শে পৌষে ইহার প্রথম খণ্ড এবং ১২৬৮ সালের প্রারম্ভে দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয়। ১২৬৯ সালের ২৫শে ভাদ্র প্রথম খণ্ডের এবং কয়েকমাস পরে দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়।

প্রথমবারে ইহার প্রচ্ছদ-পত্রে কালিদাসের "রঘুবংশম্" হইতে নিম্নলিখিত দুই পংক্তি উদ্ধৃত ছিল—

"———কৃতবাগ্‌দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।"

কিন্তু তার পরে, দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে উহার পরিবর্ত্তে মধুসূদনের সাহিত্য-সেবার মূলমন্ত্র ("শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্য্যং বা সাধয়েয়ম্")-সম্বলিত পূর্ব্বোক্ত সাঙ্কেতিক চিত্রটী বহুকাল উহার স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছিল। মধুসূদনের

সকল গ্রন্থের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠাতেই ঐ চিত্রটী মুদ্রিত থাকিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধুনা অনেক প্রকাশকগণ উহা বর্জ্জন করিতেছেন।

প্রথম বারে গ্রন্থারম্ভে নিম্নলিখিত "মঙ্গলাচরণ" ছিল;—

মঙ্গলাচরণ

বন্দনীয় শ্রীযুক্ত দিগম্বর মিত্র মহাশয় বন্দনীযবরেষু।

আর্য্য,—আপনি শৈশবকালাবধি আমার প্রতি যেরূপ অকৃত্রিম স্নেহ-ভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, এবং স্বদেশীয় সাহিত্য শাস্ত্রের অনুশীলন বিষয়ে আমাকে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন, বোধ হয়, এ অভিনব কাব্য-কুসুম তাহার যথোপযুক্ত উপহার নহে। তবুও আমি আপনার উদাবতা ও অমায়িকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সাহস পূর্ব্বক ইহাকে আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করিতেছি। স্নেহের চক্ষে কোন বস্তুই সৌন্দর্য্য-বিহীন দেখায় না।

যখন আমি "তিলোত্তমা-সম্ভব"-নামক কাব্য প্রথম প্রচার করি, তখন আমাব এমন প্রত্যাশা ছিল না যে, অমিত্রাক্ষব ছন্দ এদেশে ত্বরায় আদরণীয় হইয়া উঠিবেক, কিন্তু এখন সে বিষয়ে আমার আর কোন সংশয় নাই। এ বীজ অবসর কালেই সৎক্ষেত্রে সংরোপিত হইয়াছে; বীর-কেশরী মেঘনাদ, সুর-সুন্দরী তিলোত্তমার ন্যায়, পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে সমাদৃত হইলে, আমি এ পরিশ্রম সফল বোধ করিব—ইতি।

কলিকাতা ২২শে পৌষ, সন ১২৬৭ সাল।	দাস শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্তঃ।

দ্বিতীয় সংস্করণেও এই "মঙ্গলাচবণ" ছিল (২৫শে ভাদ্র, সন ১২৬৯ সাল)। পরে, কবি কোন ব্যক্তি-গত কারণে তাঁহার এই গ্রন্থের পরবর্ত্তী সংস্কবণ হইতে ঐ মঙ্গলাচরণটী বর্জ্জন করেন। উহাতে দুইটী লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল। তিলোত্তমাসম্ভব-প্রকাশে প্রথমে অনেকে অমিত্রচ্ছন্দকে যতটা অনাদরের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, এই অল্পকাল মধ্যেই সেই ভাবের সবিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। আর লক্ষ্য করিবার বিষয়, ইংরেজী শিক্ষিত ও স্বধর্ম্ম ত্যাগী হইলেও মধুসূদনের হিন্দুচিত বিনয়ের অভাব ছিল না;—তিনি নিজেকে "দাস" বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

দ্বিতীয় সংস্করণে কবি বহুস্থল এবং তৃতীয় সংস্করণে আবার বহুস্থল পরিবর্ত্তিত এবং অষ্টম সর্গে ৪৩১ পংক্তি হইতে ৪৯৩ পংক্তি পর্য্যন্ত নূতন রচনা সংযোজিত করিয়াছিলেন। সেই পূর্ব্ব-পাঠগুলির সহিত সংশোধিত পাঠ আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, বাক্য-বিন্যাসের উপরে অমিত্রচ্ছন্দের সুর ও সুশ্রাব্যতা কতটা নির্ভর করে।

দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে যে সংক্ষিপ্ত টীকা মূলের সহিত প্রকাশিত হইয়া আসিতেছিল, তাহা তৎকালের উদীয়মান কবি ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত।

এই কাব্যের যে কত সংস্করণ এ পর্য্যন্ত হইয়াছে, তাহা ঠিক করা দুঃসাধ্য। কবির জীবদ্দশায় প্রায় প্রতি-বৎসরে ইহার নূতন সংস্করণ বাহির হইত। তাঁহার মৃত্যুর পরে গ্রন্থ-স্বত্ব নিলামে বিক্রিত হইয়া গেলে, ক্রেতা এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ বহুকাল ধরিয়া অনেক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। পরে স্বত্বকালের অবসানে, বহুলোকে ইহার বহুবিধ সংস্করণ বাহির করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

তিলোত্তমা-সম্ভব প্রকাশিত হইলে সমাদর ও অনাদর, দুই-ই হইয়াছিল। কিন্তু অনাদর ক্রমে কম হইয়া আসিতেছিল। মেঘনাদ-বধ প্রকাশে সে অনাদর প্রায় দূর হইয়া গেল। চারিদিকে মধুসূদনের কাব্য-যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। যে বৎসরে উহা প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহার পর বৎসরে উহা বি-এ পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। নর্ম্ম্যাল স্কুলেও উহা পাঠ্য হইয়াছিল। যে-মধুসূদন একদিন তাঁহার বন্ধু ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সহিত নর্ম্ম্যাল স্কুলের শিক্ষকতা-পদ-প্রার্থী হইয়া পরীক্ষায় 'পৃথিবী' লিখিতে 'প্রথিবী' লিখিয়াছিলেন,* কিছুকাল পরেই ভূদেব বাবুকে নর্ম্ম্যাল-স্কুলে সেই-মধুসূদন-প্রণীত মেঘনাদ-বধ কাব্য পড়াইতে হইয়াছিল। বালকদিগের জন্য পদ্যপাঠ-তৃতীয়ভাগে ইহার ৪র্থ সর্গের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইয়া বঙ্গ-বিদ্যালয়-সমূহে পঠিত হইত। এই কাব্যের প্রকাশে বিদ্যাসাগর

---

* ভূদেব বাবুর সহিত কথোপকথনে "It must be প্রথিবী," মধুসূদনের এইরূপ দৃঢ়োক্তি করিবার, বোধ হয়, এই কারণ ছিল যে, তাৎকালিক প্রচলিত ১৮০৩ খৃঃ শ্রীরামপুরে মুদ্রিত কৃত্তিবাস-রামায়ণে সর্ব্বত্রই "পৃথিবী" স্থলে "প্রথিবী" দেখা যায়। সম্ভবতঃ মধুসূদন উহাই পড়িয়াছিলেন এবং ঐ জন্যই ঐ ভ্রান্ত ধারণা তাঁহার মনে তখন বদ্ধমূল ছিল।

মহাশয় এবং কলিকাতার তাৎকালিক কৃতবিদ্য মহোদয়গণ এমনই আনন্দিত হইয়াছিলেন যে ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের উদ্যোগে "বিদ্যোৎসাহিনী সভায়" সকলে সমবেত-ভাবে মধুসূদনকে মূল্যবান্ উপহারের সহিত অভিনন্দন করিয়াছিলেন। গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে-হইতেই এরূপ সমাদর, সকল কবির ভাগ্যে ঘটে না।

বঙ্গের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে এ কাব্য-সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, এখানে তাহাই উদ্ধৃত করিলাম।—

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "The Calcutta Review" পত্রিকায় বাঙ্গালা-সাহিত্য-সমালোচনায় মেঘনাদ-বধ কাব্য সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ;—

"The *Meghnada Badh* is Mr. Datta's greatest work. The subject is taken from the *Ramayana*, the source of inspiration to so many Indian poets. In the war with Ravana, Meghnada, the most heroic of Ravana's sons and warriors, is slain by Lakshman, Rama's brother. This is the subject; and Mr Datta owes a great deal more to Valmiki than the mere story. But nevertheless, the poem is his own work from beginning to end. The scenes, characters, machinery and episodes, are in many respects of Mr. Datta's own creation. In their conception and development, Mr. Datta has displayed a high order of art, and to do justice to it, or even to give a suitable idea of it, would require a much more minute examination of the poem than the space at our command will allow To Homer and Milton, as well as to Valmiki, he is largely indebted in many ways. But he has assimilated and made his own most of the ideas which he has taken, and this poem is on the whole the most valuable work in modern Bengali literature. The characters are clearly conceived and capable of winning the reader's sympathy. The machinery, including a great deal that is supernatural, is skilfully and easily handled. The imagery is graceful and tender and terrible in turn. The play of fancy gives constant variety. The diction is richly poetic, and the words so happily chosen as constantly to bring up by association ideas congruous to those which they directly express. Nor is the verse broken up into couplets complete in themselves, in the Sanskrit fashion, but abounding like Milton's in variety of pause, it seems to us musical and graceful, as well as a fitting vehicle for passionate feelings. Mr.

Datta, however, is not faultless. He wants repose. The winds rage their loudest when there is no necessity for the lightest puff. Clouds gather and pour down a deluge, when they need do nothing of the kind; and the sea grows terrible in its wrath, when everybody feels inclined to resent its interference. All this bombast is unworthy of Mr. Datta's genius and cultivated taste. Equally so is his constant repetition of the same images and phrases till they almost nauseate his readers. Nor is he altogether innocent of plagiarism. Homer and Valmiki are not unfrequently put under contribution, and Milton and Kalidasa have equal reason to complain.

Then again grammar might have been respected; and we must strongly protest against the constant introduction, in imitation of the English idiom, of such verbs as *Stutila, Swanila, Nirghosila.*

We have given no extracts from the *Meghnda Badh*, because we could give no adequate idea of its merits by isolated quotations. The poem is beautiful as a whole, but single passages would give no more idea of it than a brick could give of the building from which it was taken."

ইহার পরে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় তাঁহার Literature of Bengal গ্রন্থে এই কাব্য-সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ;—

"The reader who can feel and appreciate the sublime, will rise from a study of this great work with mixed sensations of veneration and awe, with which few poets can inspire him, and will candidly pronounce the bold author to be indeed a genius of a very high order, second only to the highest and the greatest that have ever lived, like Vyasa, Valmiki or Kalidas; Homer, Dante or Shakespear."

অবশেষে, প্রগাঢ় দার্শনিক পণ্ডিত ৺ স্যার ব্রজেন্দ্র নাথ শীল এম্-এ, মহাশয় মেঘনাদ-বধ কাব্যের যে আর্ট-সমালোচন (higher criticism) করিয়াছেন, শ্রদ্ধার সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম ;—

"The later Bengali epics are all chiselled into classic grace and repose. But, studied historically, they exhibit an internal life and movement. The Meghnadabadha of Michael Madhusudan Dutt is classic both in style and conception, though the groundwork of the

plot is derived from strictly oriental sources. Nothing can be a stronger testimony to the reality of Hegel's distinction between orientalism and classicism than this strange phenomenon in the history of poetic art, a splendid Parian monument of transparent classic art built on oriental foundation, a stately pantheon on the site of a Pagoda. The phenomenon is unique and offers an *experimentum crucis* in favour of Hegel's classification of art. The next epic, Babu Hem Chandra Banerji's Vritrasanhara, occupies a still more curious position. The traditional material is Puranic, and is thus derived from the great store house of neo-oriental mythology. But the treatment is classic, not, however, as in Meghnadbadha in the genuine sculptural style which is most typical of classic art, but in the more mixed Romanarchitectural fashion, and the result is that both in style and conception, there is an expansiveness, a tendency to the illimitable and the formless, which savours more of the neo-classical than of the genuine classical epoc. * * * we have the poetry of Sculpture as often in Madhusudana Dutt, an entire absence of colouring, being compensated by the preternatural clearness and distinctness of form and proportion, and the poetic perception of symmetry and living expression. * * * With Michael Madhusudan Dutt, the conflict of force which is constitutive of the epic poem has already raised itself in Miltonic fashion from the physical plane to the moral platform, herein transcending the classic conception,—though, of course the *deus ex machina* is there still in full working, this commingling of the supernatural with the natural, of the superhuman with the human, of the miraculous, the mythical, and the improbable with the historical and the actual, being a distinctive trait of the epic symbolism or Vorstellung."

(*New Essays in Criticism—1903*)

১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিবিতরণ উৎসবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণের কিয়দংশ—

"ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে মাইকেলের অধিকার ছিল প্রশস্ত, অনুরাগ ছিল সুগভীর। সেই সঙ্গে গ্রীক লাটিন আয়ত্ত ক'রে য়ুরোপীয় সাহিত্যের অমরাবতীতে

তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন ও তৃপ্ত হয়েছেন সেখানকার অমৃতরস-ভোগে। স্বভাবতই প্রথমে তাঁর মন গিয়েছিল ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা করতে। কিন্তু একথা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয়নি যে, ধার-করা ভাষায় সুদ দিতে হয় অত্যধিক, তার উদ্বৃত্ত থাকে অতি সামান্য। তিনি প্রথমেই মাতৃভাষায় এমন একটি কাব্যের আবাহন করলেন যে-কাব্যে স্খলিতগতি প্রথম-পদচারণার ভীরু সতর্কতা নেই। এই কাব্যে বাহিরের গঠনে আছে বিদেশী আদর্শ, অন্তরে আছে কৃত্তিবাসী বাঙালি কল্পনার সাহায্যে মিল্‌টন-হোমর-প্রতিভার অতিথি-সৎকার। এই আতিথ্যে অগৌরব নেই, এতে নিজের ঐশ্বর্য্যের প্রমাণ হয় এবং তার বৃদ্ধি হোতে থাকে।”

ছন্দ ও ভাষা

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—বাঙ্গালা-সাহিত্যে এখন যে যুগ চলিতেছে, মধুসূদনই তাহার প্রবর্ত্তক; তাঁহার কাব্য, নাটক ও প্রহসন,—সকল গুলিই যুগ-প্রবর্ত্তক। প্রথমতঃ, বাঙ্গালা সাহিত্যে ঐ গুলি নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালা-সাহিত্যে প্রতীচ্যের প্রভাব মধুসূদনের কাব্যাদি হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং মধুসূদন প্রবর্ত্তিত সাহিত্যকে নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যের দিক দিয়াই দেখিতে হইবে। ভবভূতির উত্তর-রাম-চরিত যেমন রাম-চরিত হইলেও ধর্ম্ম-সাহিত্য নহে, মেঘনাদ-বধও তেমনি রামায়ণ ঘটিত কথা লইয়া রচিত হইলেও ধর্ম্ম সাহিত্যের চক্ষে আলোচ্য নহে; উহা নব্য-বঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন-সাহিত্য-প্রতিষ্ঠার প্রথম ও প্রধান জয় পতাকা;—এবং যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং যাহা মধুসূদনের সাহিত্য-প্রচেষ্টার মূল-মন্ত্র ছিল, মেঘনাদ-বধে তাহা ঘনিষ্ঠভাবে ও চরম-রূপে অভিব্যক্ত। ইহার মূল উপাদান বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে গৃহীত; ঘটনা-পরম্পরার সংঘটনে গ্রীক্-নিয়তি-বাদ ও হোমরের ইলিয়াড-কাব্যের প্রভাব সুস্পষ্ট; ইহার ছন্দে ও ভাষায় মিল্‌টনের গম্ভীর ও উদাত্ত স্বর শ্রুত হয় এবং ইহার অলঙ্কার-পারিপাট্য সংস্কৃত-কাব্যাদির আদর্শে। তাহা ছাড়া, স্থলে-স্থলে যেমন

বাল্মীকি-ব্যাস, কালিদাস-ভবভূতি, কৃত্তিবাস-কাশীদাসাদির পদাঙ্ক লক্ষিত হয়, তেমনি স্থলে-স্থলে আবার Homer, Virgil, Dante, Tasso, Shakespeare, Milton ইত্যাদিকেও স্মরণ করাইয়া দেয়। মেঘনাদ-বধ কাব্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই অপূর্ব্ব সম্মিলন যেন মূর্ত্তিমান হইয়া সেকালে বঙ্গীয় সাহিত্য-জগতে এক অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। বাস্তবিকই, এই কাব্যে কবির উদ্দাম কল্পনা মধুকরীর ন্যায় নানা কবির "চিত্ত-ফুলবন-মধু" লইয়া এই অপূর্ব্ব "মধুচক্র" রচনা করিয়াছে!

বাঙ্গালা-সাহিত্যে এই যে নবযুগ-প্রবর্ত্তন, ইহা শুধু কাব্যের প্রকৃতিগত নূতনত্বেই পর্য্যবসিত হয় নাই; ইহার আকৃতি-গত নূতনত্বই অর্থাৎ ইহার ছন্দ ও ভাষার ও রচনা-ভঙ্গির অভিনবত্বই তৎক্ষণাৎ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ১৮৬০ সালে তিলোত্তমা-সম্ভব প্রকাশিত হইবামাত্র, উহার অভিনব ছন্দ লইয়া এক তুমুল কল্লোল-কোলাহল উত্থিত হয়। একদিকে ইংরেজী-শিক্ষিতের দল ইহাতে Paradise Lost কাব্যের ছন্দের ও ভাষা-গাম্ভীর্য্যের আস্বাদে মোহিত হইয়া শত মুখে ইহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন; অপর দিকে, সংস্কৃত-পণ্ডিতের দল "ভাষা"-কাব্যে পয়ারাদি মিত্রাক্ষর-ছন্দের পরিবর্ত্তে এক কিম্ভূতকিমাকার ছন্দ, যাহা পয়ারের মত করিয়া আবৃত্তি করিতে গেলে নিতান্ত হাস্য-জনক হয় দেখিয়া, ঐ ছন্দের প্রতি বিরক্ত হইয়া তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত গুণগ্রাহী লোকও প্রথম প্রথম এই দলভুক্ত ছিলেন। পরে, তাঁহার গুণ-গ্রাহিতা-গুণে তিনি মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এমন কি, পর বৎসরে, মেঘনাদ-বধ প্রকাশিত হইলে, তিনি ইহার পক্ষপাতীই হইয়াছিলেন। এই গুণগ্রাহিতায় মুগ্ধ হইয়া মধুসূদন তাঁহার অমিত্রছন্দীয় শেষ-কাব্য "বীরাঙ্গনা" বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই উৎসর্গ করেন। এখন আর সে দিন নাই; এখন এ দলের সকলের না হউক, অনেকেরই কান এ ছন্দে অভ্যস্ত হইয়াছে। আবৃত্তি করিতে পারিলে, ইহা অতীব সুমিষ্ট, এখন তাহা এ দলের অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পরবর্ত্তী

কোন কবিই এমন সঙ্গীত-স্বাদ-বিশিষ্ট, সুমিষ্ট অমিত্রচ্ছন্দ রচনা করিতে সমর্থ হয়েন নাই ;—চেষ্টা করিয়াছেন প্রায় সকলেই ; কিন্তু মধুসূদনের মত কৃতকার্য্য কেহই হয়েন নাই। এমত অবস্থায় ইহার বৈশিষ্ট্য কিসে, কোন্ কোন্ গুণে ইহা এমন শ্রেষ্ঠ, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিবার বিষয়।

একদল সমালোচক ইহার ভাষারও নিন্দা করিয়া থাকেন। ইহা আভিধানিক-শব্দ-বহুল বলিয়া নিন্দা করিবার সময়ে তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, সংস্কৃত-কাব্যাদির ভাষাও সমধিক আভিধানিক-শব্দ-সম্পন্ন এবং যে Paradise Lost হইতে "Miltonic grandeur" ইংরেজীতে প্রবাদ-বাক্য হইয়াছে, তাহার ভাষাও কম আভিধানিক শব্দ-বহুল নহে। এই কারণে মেঘনাদ-বধের ছন্দের সঙ্গে উহার ভাষারও আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

বস্তুতঃ, ভাষা, ছন্দ-অলঙ্কার, ইত্যাদিই কাব্যে রস-ব্যঞ্জনার উপাদান (Structural elements)। উহারা যথাযথ সন্নিবেশিত হইয়া যে-রূপ ধারণ করে, তাহার ভিতর দিয়াই রস-বস্তুর আস্বাদ গ্রহণ করিতে হয়। কারণ, কাব্যের রস বা প্রাণ-বস্তু বুঝাইবার সামগ্রী নহে ; উহা কেবল মাত্র অনুভূতি-গ্রাহ্য। এইজন্য কাব্য-বিচারে কাব্যের রূপ-বিচারই প্রথম কথা অর্থাৎ কবি যে রূপের ভিতর দিয়া কাব্যান্তর্গত রসকে অনুভূতি-গ্রাহ্য করিতে চাহিয়াছেন, তাহার দ্বারা উদ্দিষ্ট রস প্রকৃষ্ট ভাবে অনুভূতির অধিগম্য হইয়াছে কি না, প্রধানতঃ ইহাই কাব্য-বিচার। ইহা সংস্কৃত-রীতি এবং আমার মনে হয়, কাব্য-বিচারে এই পন্থাই সরল ও সুগম। এই ভূমিকায় সংক্ষেপে ঐ পন্থায় কাব্য-বিচার করা যাইতেছে।

কি জড়-জগৎ, কি জীব-জগৎ, সর্ব্বত্রই ক্রিয়া ছন্দোময়ী। মানুষের ভাবোচ্ছাসও ছন্দে প্রকাশিত হয়। নিতান্ত অসভ্য জাতিদের মধ্যেও বিজয়োল্লাস, যাহা তাহাদের একমাত্র উল্লাসের বিষয়,—তাহাও ছন্দোময় নৃত্য ও স্বরে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সভ্য জাতিদের মধ্যেও সকল প্রকার ভাবের অভিব্যক্তিতেই, বিশেষতঃ করুণ স্বরে ক্রন্দনে, কিম্বা ক্রোধ-ভরে তর্জ্জন-গর্জ্জনে একটা ছন্দ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। এরূপ হইবারই কথা। ক্রিয়াশীল শক্তির সহিত ক্রিয়াশীল শক্তির

বিরোধ ও সংঘর্ষ হইতেই ছন্দের উৎপত্তি। * সৌরজগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষের মনোভাবের অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রই ঐ নিয়মে ছন্দের উৎপত্তি। মানুষের মনে প্রবল ভাব-স্রোত যখন কার্য্যে বা কথায় প্রকাশিত হয়, তখন তাহা ছন্দোনিয়মিত নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা বাধিত হইয়া, ছন্দেই আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং ভাবের অভিব্যক্তিতে ছন্দ অনিবার্য্য ও স্বাভাবিক এবং স্বাভাবিক বলিয়াই সুন্দর। সৌন্দর্য্য-জনক বলিয়া "ছন্দস্" অর্থে দীপ্তি পাওয়া। ছন্দোবদ্ধ রচনা ভাবকে উজ্জ্বল করে। মাত্রা-বিশিষ্ট রচনাই কবিতা এবং বিশেষ-বিশেষ মাত্রা, বিশেষ-বিশেষ ছন্দ বলিয়া অভিহিত। সঙ্গীতে ও নৃত্যে যাহা "তাল," কবিতায় তাহাই "ছন্দ"। তাল যেমন সঙ্গীতের ও নৃত্যের সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধক, ছন্দও তেমনই কবিতার উৎকর্ষ-সাধক; এমন কি, সুলেখকের হাতে ভাবময়ী গদ্য-রচনাতেও একটা ছন্দ লক্ষিত হয় এবং সেইরূপ গদ্যই কবিতার স্বাদ-বিশিষ্ট ও সুমিষ্ট।

সঙ্গীতাদিতে যেমন মাত্রাই তাল-নির্দ্দেশক, কবিতাতে তেমনিই মাত্রাই ছন্দোনির্দ্দেশক। মাত্রা-ভেদে তাল যেমন নানাবিধ, মাত্রা-ভেদে কবিতায় ছন্দও তেমনি নানাবিধ। সংস্কৃত-কবিতায় মাত্রা উচ্চারণ-গত অর্থাৎ শব্দোচ্চারণের হ্রস্ব-দীর্ঘ-ভেদে মাত্রা-ভেদ এবং মাত্রার বিশেষ-বিশেষ সমাবেশ বিশেষ-বিশেষ ছন্দ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং সংস্কৃতে, চরণে-চরণে শেষাক্ষরের মিল বা অমিলের সহিত ছন্দের কোন সম্বন্ধ নাই। বস্তুতঃ, সংস্কৃত কবিতা "মিত্রাক্ষর" নহে; অথচ ছন্দোগুণে চমৎকার শ্রবণ-সুখকর!

বাঙ্গালায় হ্রস্ব-দীর্ঘ কেবল অক্ষর-গত; উচ্চারণ-গত নয়। সুতরাং বাঙ্গালায় ছন্দও অক্ষর-মাত্রিক। উচ্চারণের হ্রস্বতা বা দীর্ঘতার সহিত বাঙ্গালায় প্রায় কোন ছন্দেরই কোন সম্বন্ধ নাই। কেবল "তোটক" অক্ষর-মাত্রিক হইলেও, সংস্কৃতানুযায়ী হ্রস্ব-দীর্ঘ-মাত্রানুসারে নিয়মিত এবং আরও দুই-একটি বাঙ্গালা ছন্দে

* "Rhythm results wherever there is a conflict of forces not in Equilibrium"—H. Spencer.

অক্ষর-মাত্রার সহিত উচ্চারণ মাত্রাও লক্ষিত হয়। তাহা হইলেও, সাধারণতঃ বাঙ্গালায় ছন্দকে অক্ষর-মাত্রিকই বলিতে হইবে।

দুই প্রকারে বাঙ্গালায় এই অক্ষর-মাত্রিক ছন্দের শ্রুতি-মাধুর্য্য সাধন করা হইয়াছে;—যতি-স্থাপন করিয়া এবং চরণের শেষে বা যতির শেষে অক্ষরের "মিত্র"তা অর্থাৎ মিল করিয়া। ফলে, বাঙ্গালায় কবিতামাত্রেই মিতাক্ষর, মিত্রাক্ষর এবং নিয়মিত-যতি-(অর্থাৎ বিরাম) বিশিষ্ট। অক্ষরের সংখ্যা-ভেদে ও যতি-ভেদে নানাবিধ ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু সর্ব্বত্রই মিত্রাক্ষর।

মিত্রাক্ষর-বিশিষ্ট নানারূপ ছন্দ থাকিলেও, বাঙ্গালায় চতুর্দ্দশাক্ষরী পয়ারেরই আধিপত্য ছিল। বড়-বড় কাব্যে ক্বচিৎ রস-বিশেষে ত্রিপদী-আদি দ্বারা কিঞ্চিৎ ছন্দোবৈচিত্র্য ঘটনা হইত মাত্র। সুতরাং বঙ্গের কাব্য-ভূমি পয়ার-প্লাবিত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পয়ারের পসার যখন সকল কাব্য-গ্রন্থেই এত বেশী, তখন তাহার নিগূঢ় কারণ অবশ্যই আছে এবং তাহা এই যে, চতুর্দ্দশাক্ষরী মাত্রা ঠিক যেন আমাদের সহজ নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মাপে গঠিত। উহা পড়িতে সহজ নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে খর্ব্ব করিতে হয় না, দীর্ঘ করিতেও হয় না; অর্থাৎ উহার তাল দ্রুতও নহে, বিলম্বিতও নহে;—উহা সহজ ও স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া, ত্রিপদী, চতুষ্পদী অপেক্ষা ইহাতে মিত্রাক্ষরের জটিলতাও কম;—দুই চরণে মাত্র। এইজন্য, কি প্রাচীন, কি আধুনিক, সকল বাঙ্গালা-কাব্যাদিতেই পয়ারের বহুল ব্যবহার লক্ষিত হইয়া থাকে।

আদর্শ মিত্রাক্ষর-পয়ার রচনা করিতে হইলে, ছন্দ সম্বন্ধে তিনটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়—চৌদ্দ অক্ষরে চরণ, চরণ-দ্বয়ের শেষাংশের উচ্চারণে মিল এবং অষ্টমাক্ষরে যতি অর্থাৎ স্বল্প বিরাম। এই যতি সুশ্রাব্য হইতে হইলে, স্বাভাবিক অর্থাৎ শব্দের শেষে হওয়া উচিত। সুতরাং মিত্রাক্ষর পয়ারে কবির ভাব চারিপ্রকার বন্ধনে বন্দী। জেলের কয়েদী, হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ী লইয়া যেরূপ ভাবে চলে, তাহাতে একটা ছন্দ নাই, বলি না; তাহাতেও সুন্দর ছন্দ আছে, সত্য; কিন্তু সে ছন্দ স্বাধীন ব্যক্তির চলা-ফেরার ছন্দ নহে; তাহা আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক।

মিত্রাক্ষর পয়ারে কবিতাও তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট অক্ষর গণিয়া পা ফেলিয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থলে থামিয়া-থামিয়া, চরণে-চরণে মিল রাখিয়া, একটা সুন্দর ছন্দে চলে বটে;—কিন্তু আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক। আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক বলিয়াই সুদীর্ঘ পয়ার সজীবতার বৈচিত্র্যহীন একটা একঘেয়ে ব্যাপার। ছোট-খাট কবিতায় ভাল লাগিতে পারে; কিন্তু দীর্ঘ কবিতায় নিদ্রাকর্ষক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। "পাখী সব করে রব" ইত্যাদি আদর্শ পয়ার এবং অল্প স্বল্প বলিয়াই মিষ্ট লাগে। কিন্তু অল্প-স্বল্প না হইয়া, যদি উহা ক্রমাগত চলিত, তাহা হইলে উহার আদর্শত্ব রক্ষা করা সহজ হইত না এবং বৈচিত্র্য-হীনতায় উহার মিষ্টত্বেরও হ্রাস হইত। বস্তুতঃ ভাবকে, ভাষাকে নানাবিধ নিয়মে চালাইতে হইলে, সর্ব্বত্র নিয়ম রক্ষা করা সুকঠিন। যে-কোন কাব্য হইতে দীর্ঘ-ব্যাপী পয়ার পড়িলেই দেখা যায়, কোথাও ভ্রষ্ট-মাত্রা, কোথাও ভ্রষ্ট-যতি, কোথাও মধ্যম মিল বা অধম মিল, নয় ত গোঁজা মিল! অষ্টমাক্ষরে অথচ একটি শব্দ-শেষে যতিটি হওয়া সব সময়ে সহজ নয়। কাজেই অনেক স্থলে ভ্রষ্ট-যতি-যুক্ত পয়ার, ছন্দ বজায় রাখিয়া পড়িতে গেলে, "তুমি অন্নদা কাশীতে" হইয়া দাঁড়ায় "তুমি-অন্ন-দাকা-শীতে"। সুতরাং ছোট কবিতায় মিত্রাক্ষর ভাল লাগিলেও দীর্ঘ-ব্যাপী রচনায় উহা নানা রকমে ভ্রষ্ট-সৌন্দর্য্য হয় এবং শব্দ-সম্পন্ন কবির হাতে তাহা না হইলেও, আড়ষ্ট ও বৈচিত্র্য-হীন হইয়া থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কয়েক ছত্র অমিত্রাক্ষর কবিতাকে পয়ারে পরিবর্ত্তিত করিলেই মিত্রাক্ষরচ্ছন্দে কবিতা যে কিরূপ আড়ষ্ট-ভাবাপন্ন হয়, তাহা বুঝা যাইবে—

সন্মুখ সমরে পড়ি বীরবাহু বীর।
অকালেতে যবে গেলা যমের মন্দির॥
কহ দেবী অমৃতভাষিণী সরস্বতী।
কোন্ রক্ষোবীরবরে করি সেনাপতি॥
রাক্ষসাধিপতি পুনঃ পাঠাইলা রণে।
অমর ব্রহ্মার বরে, হেন পুত্র ধনে॥

কহ, কি কৌশলে তারে মারিয়া লক্ষ্মণ।
নিঃশঙ্কিলা দেবেন্দ্রের সশঙ্কিত মন॥
বন্দি চরণারবিন্দ অতি মন্দমতি।
আবার ডাকিছে তোমা, হে মাতঃ ভারতি॥
বাল্মীকি মুনিরে দয়া করিলা যেমতি।
রসনায় বসি তার, পদ্মাসন পাতি॥
যবে ক্রৌঞ্চ-বধূ সহ তমসার তীরে।
ত্যজিলা পরাণ ক্রৌঞ্চ নিষাদের তীরে॥
তেমতি দাসের প্রতি দয়া কর, সতি।
তব পদাম্বুজ-যুগে এ মম মিনতি॥

মেঘনাদ-বধ কাব্যের আরম্ভের কয়েক পংক্তির সহিত উহার ভাব ও ভাষা প্রায় এক হইলেও, মিত্রাক্ষরের বন্ধনে উহা আড়ষ্ট হইয়াছে, স্পষ্টই বুঝা যায়। এইরূপ আড়ষ্ট ভাব দীর্ঘ-ব্যাপী হইলেই, একঘেয়েত্ব অনিবার্য্য।*

কবিতাকে এই নিগড়-দায় হইতে মুক্তি দিবার জন্যই মধুস্থদন বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। সকল দেশের উৎকৃষ্ট কাব্যাদির সহিত তাঁহার সবিশেষ পরিচয় থাকিলেও, মহাকাব্য-রচনায় ছন্দে ও শব্দ-গাম্ভীর্য্যে ইংলণ্ডীয় কবি মিল্‌টনের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি মিলটনের অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে ও শব্দ-গাম্ভীর্য্যে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, বাঙ্গালায় ঐ নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য, অসামান্য ক্ষমতা ছিল বলিয়াই, তিনি এ কার্য্য এমন করিয়া সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন যে, আজিও এ ক্ষেত্রে তিনি একেশ্বর ও অদ্বিতীয়।

* ৺রাজেন্দ্র লাল মিত্রও তাঁহার এক পত্রে বলিয়াছেন—"the jingling monotony of the পয়ার। "সোম প্রকাশ" সম্পাদক পণ্ডিত ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও বলিয়াছেন,—"অমিত্রাক্ষর পদ্য ব্যতিরেকে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নহে। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতিতে যে সমস্ত পদ্য আছে, তাহা মিত্রাক্ষর। কোন প্রগাঢ় বিষয়ের রচনার তাহা উপযোগী নহে"—(সোমপ্রকাশ, ২৩ শ্রাবণ ১২৬৭ সাল)

এখন দেখা যাউক, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দের বিশেষত্ব কিসে ?—শুধু বীর বা রৌদ্র রসাদিতে নহে, করুণাদি সকল রসেই উহা যেমন সুন্দর শ্রবণ-সুখকর, তেমনই রসোৎকর্ষক হইয়াছে কেন ? উহাতে মিত্রাক্ষরের মিলের মাধুর্য্য নাই, নিয়মিত যতির ছন্দ-সৌন্দর্য্য নাই, তবুও উহা ভাবোদ্দীপক ও সুমিষ্ট কেন ?—

প্রথমতঃ,—মধুসূদন যতির খাতিরে কোথাও বাক্যের সঙ্কোচ করেন নাই। তাঁহার কবিতায় দুই চরণেই ভাবটি শেষ করিবার চেষ্টামাত্রও লক্ষিত হয় না। তাহাতে তাঁহার বাক্য-স্ফূর্ত্তি কোথাও কোনরূপ বাধা পায় নাই। তাঁহার ভাব ও বাক্য যতির বশে নহে; যতিই তাঁহার ভাব ও বাক্যের বশে। সুতরাং যেখানে ভাব শেষ হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার যতি। একটা কৃত্রিম বন্ধনে ভাব ও ভাষাকে না বাঁধিয়া, ভাব ও ভাষাকে স্বাধীন-ভাবে চলিতে দেওয়ায়, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর কবিতায় একঘেয়েত্বের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। প্রতি পদেই যতির বৈচিত্র্য। কবি তাঁহার প্রবর্ত্তিত এই ছন্দ-সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন—"I find that the যতি instead of being confined to the 8th syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 10th, 11th, and 12th and so on." এখানে "naturally" কথাটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাবটি যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখানে যতি হওয়াই "স্বাভাবিক"। পয়ারে নির্দ্দিষ্ট স্থলে যতি-স্থাপনের নিয়মে কবিতায় একটা সুন্দর ছন্দ থাকিলেও, অস্বাভাবিকতা আসিয়া পড়ে। ভাবের প্রকাশে স্বাভাবিকতাই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দের প্রধান বিশেষত্ব। এই স্বাধীন ছন্দে পদে-পদে বৈচিত্র্য আছে বলিয়া দীর্ঘ কবিতাতেও একটা আড়ষ্ট ভাব লক্ষিত হয় না এবং পড়িতে বা শুনিতে ক্লান্তি আসে না। সৈন্যগণ যখন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, নিয়মিত-পরিসর-বদ্ধ হইয়া, নিয়মিত তালে পা ফেলিয়া চলিয়া যায়, তখন কিয়ৎক্ষণ তাহা দেখিতে সুন্দর লাগে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈচিত্র্য-হীনতা বশতঃ তাহা বেশীক্ষণ ধরিয়া দেখিতে হইলে, চক্ষুর ক্লান্তি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মেলায় যখন লোকরাশি স্বাধীন-ভাবে চলা-ফেরা করে,—কেহ দ্রুত-ভাবে, কেহ ধীরে, কেহ হাত নাড়িয়া, কেহ ঘাড় বাঁকাইয়া—নানা লোকে নানা রকমে চলা-ফেরা করে—

লোকরাশির এইরূপ বন্ধন-হীন স্বাধীন গতাগতি অনেকক্ষণ দেখিলেও ক্লান্তি-বোধ হয় না। কারণ, ইহাদের চলা-ফেরা স্বাভাবিক। স্বাভাবিকতায় একটা চমৎকার সৌন্দর্য্য আছে, যাহা কৃত্রিম সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অধিকতর হৃদয়াকর্ষক। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দের এই স্বাভাবিকতাই ইহার প্রধান বিশেষত্ব। এই স্বাভাবিকতা-গুণেই ইহা বীর, রৌদ্র, ভয়ানকাদি রসেও যেমন সেই-সেই রসের উৎকর্ষক হইয়াছে, আবার করুণেও এই স্বাভাবিকতা-গুণেই উহা তেমনই মর্ম্মস্পর্শী হইয়া, আদর্শ করুণ-রসের সৃষ্টি করিয়াছে। বাস্তবিক, আদর্শ অমিত্রচ্ছন্দের কবিতা স্বাভাবিকতায় ভাবাত্মক গদ্যের ন্যায়, অথচ সঙ্গীতের স্বাদ-বিশিষ্ট।

কবি নিজে, যিনি কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য, সকল দেশের সুকাব্যের সহিত সুপরিচিত ছিলেন, এবং সঙ্গীতের আস্বাদও যাঁহাকে মুগ্ধ করিত, তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

(Bengali Blank Verse) "if well recited, sounds as much like prose as English Blank Verse sounds like English prose retaining at the same time a sweet musical impression."

মিত্রাক্ষর-কবিতার ক্রম-পরিণতির দিকে দৃষ্টি করিলেই বুঝা যায় যে, মিত্রাক্ষরচ্ছন্দ, একঘেয়েত্ব নিবারণের নিমিত্ত, শুধু মিত্রাক্ষরতা-মাত্র রক্ষা করিয়া কত-রকম বিচিত্র যতিতে, বিচিত্র গতিতে, স্বাধীনতা খুঁজিয়া চলিয়াছে! তাহাতে অক্ষর-মাত্রার কোন নিয়ম নাই; যতিরও কোন নিয়ম নাই। কেবল চরণের শেষে মিল আছে; তাহারও কোন নিয়ম নাই। কানের সুরে বাঁধা, অথচ ছন্দময়ী কবিতা; শুনিতেও বেশ মিষ্ট;—ছোট-ছোট গীতি-কবিতায় একঘেয়ে হইবার সম্ভাবনা নাই;—বেশ লাগে। ইংরেজী গীতি-কবিতাতে এইরূপ বিচিত্র ছন্দের বহুল প্রচলন হইয়াছে; দেখাদেখি, আমাদের গীতি-কবিতাতেও এইরূপ অনিয়মিত মিত্রাক্ষরচ্ছন্দ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজীর অনুকরণে আর-একপ্রকার মিত্রাক্ষর পয়ার প্রচলিত হইয়াছে;—তাহা কতকটা অমিত্রাক্ষরের স্বাদ-বিশিষ্ট অথচ মিত্রাক্ষর। তাহা চতুর্দ্দশাক্ষর পয়ারেরই মত; কিন্তু যতি অমিত্রচ্ছন্দের ন্যায় ভাবানুসারিণী। সুতরাং,

তাহা আবৃত্তি করিতে, ঠিক অমিত্রচ্ছন্দেরই স্বাদ পাওয়া যায় ; অথচ তাহা মিত্রাক্ষর। বলা বাহুল্য, এরূপ কবিতার আবৃত্তিকালে উহার মিল কানে তেমন লাগে না। সুতরাং, উহার মিত্রাক্ষরতা মিত্রাক্ষর পয়ারের মত সার্থক নহে। অথচ এই মিলের জন্য কবিকে কিছু-না-কিছু বন্ধনে পড়িতে হয়। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে, মিত্রাক্ষরচ্ছন্দের গতি স্বাধীনতা ও স্বাভাবিকতার দিকে এবং সেই স্বাধীনতা ও স্বাভাবিকতা অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। মিত্রাক্ষরের মিল ও যতির মাধুর্য্যের বিনিময়ে অমিত্রচ্ছন্দের স্বাধীনতা ও স্বাভাবিকতা ভাব-ব্যঞ্জনার হিসাবে সমূহলাভ, ইহা কে না স্বীকার করিবে ?

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর কবিতার দ্বিতীয় বিশেষত্ব, অসাধারণ শব্দ-সম্পদে উৎসাহ, রাগ, ভয়, বিস্ময়াদি মনোভাব যেমন বিশেষ-বিশেষ দৈহিক আড়ম্বরের সহিত প্রকাশিত হয়, কবিতাতে তাহা প্রতিফলিত করিতে হইলে, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, অদ্ভুতাদি রসের প্রকাশে তেমনই তদুচিত বাক্যাড়ম্বরের প্রয়োজন। সকল কবিই ইহা বুঝেন। কিন্তু মধুসূদন এ বিষয়ে যেমন মনোযোগী, এমন আর কেহই নহেন। ভারতচন্দ্র কতকগুলি শব্দানুকারী বাক্যের দ্বারা ও দ্রুতগামী ছন্দে "দক্ষ-যজ্ঞ নাশ" স্বল্পের মধ্যেই সারিয়াছেন ; কিন্তু যদি তাঁহাকে আর-একটা যজ্ঞ নাশ করিতে হইত, তাহা হইলে শব্দানুকারী বাক্যে কুলাইত কি না, সন্দেহ। মেঘনাদ-বধ কাব্যে কবিকে নানা স্থানে বীর, রৌদ্রাদি রসের অবতারণা করিতে হইয়াছে ; তাহাতে আবার ছন্দোবৈচিত্র্য নাই। কাজেই তাঁহাকে রসোপযোগী শব্দ চয়ন করিয়া তদ্দ্বারা রসের বিকাশ করিতে হইয়াছে। শব্দ দ্বারাই যখন কবিকে উৎসাহ, রাগ, ভয়, বিস্ময়াদি ভাব-সকলকে কবিতায় প্রতিফলিত করিতে হয়, তখন রসোপযোগী শব্দ চয়ন করাই ত কাব্য-শিল্পীর প্রকৃষ্ট পন্থা। মধুসূদন তাহাই করিয়াছেন ;—

"——সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গম্ভীর জীমূত-মন্দ্রে। সে ভৈরব রবে,
সাজিল কর্ব্বুরবৃন্দ বীর-মদে মাতি,

দেব-দৈত্য নর-ত্রাস। বাহিরিল বেগে
বারী হ'তে (বারি স্রোতঃ-সম পরাক্রমে
দুর্ব্বার) বারণ-যূথ ; মন্দুরা ত্যজিয়া
বাজীরাজী, বক্র-গ্রীব, চিবাইয়া রোষে
মুখস্।" ইত্যাদি— (প্রথম সর্গ)

এখানে শব্দ-গুণে বীরোচিত আয়োজনের এই বর্ণনাটিতে উৎসাহ যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে।

"বাহিরিল অগ্নি-বর্ণ রথগ্রাম বেগে,
স্বর্ণধ্বজ ; ধূম-বর্ণ বারণ, আস্ফালি
ভীষণ মুদ্গর শুণ্ডে, বাহিরিল হ্রেষে
তুরঙ্গম ; চতুরঙ্গে আইলা গর্জ্জিয়া
চামর, অমর-ত্রাস ; রথীবৃন্দ-সহ
উদগ্র, সমরে উগ্র, গজবৃন্দ-মাঝে
বাস্কল, জীমূত-বৃন্দ-মাঝারে যেমতি
জীমূত-বাহন বজ্রী, ভীম বজ্র করে।
বাহিরিল হুহুঙ্কারি অসিলোমা বলী,
অশ্ব-পতি ; বিড়ালাক্ষ পদাতিক দলে,
মহা ভয়ঙ্কর রক্ষঃ, দুর্ম্মদ সমরে।"—(সপ্তম সর্গ)

এখানে শব্দাড়ম্বরে যুদ্ধায়োজনের শব্দময় আড়ম্বরটি সুন্দর প্রতিফলিত হইয়াছে। যুদ্ধের উৎসাহময় উদ্যোগটী শুধু যে বায়স্কোপের ন্যায় চক্ষের সম্মুখে সজীব-ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা নহে ; উহার আনুষঙ্গিক শব্দাড়ম্বরটিও এই শব্দ-চিত্রে যেন সজীবতা লাভ করিয়াছে ;—মনে হয়, যেন উদ্যোগাড়ম্বরের শব্দটিও কানে শুনা যাইতেছে। ইহাই ত বাক্যে রস-সৃষ্টি ;—ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিলে মনে যে-ভাব হইত, চক্ষু যাহা দেখিত, কর্ণ যাহা শুনিত, তাহারই মানস-চিত্র বাক্যে প্রতিফলিত

করা। * শব্দাড়ম্বর-ব্যতীত এমন আড়ম্বরময় উদ্যোগের কাব্যোচিত বর্ণনা, এমন শব্দ-চিত্র, আর কিরূপে হইতে পারে? সরল ভাষা তরল ভাবেরই উপযোগী; গম্ভীর ভাব প্রকাশ করিতে হইলে, ভাষাও গাম্ভীর্য্যময় হওয়াই সঙ্গত। শব্দ একটা নির্জীব কাঠের পুতুল নহে, অবহেলার সামগ্রী নহে। উহার একটা নিজস্ব শক্তি, গুণ ও তদুচিত মর্য্যাদা আছে। নিপুণ শিল্পী সেই শব্দ-শক্তিকে কাজে লাগাইয়া রসোৎকর্ষ সাধন করেন। "গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী," আর "খুব জোরে যেমন মেঘ ডাকে"; "দম্ভোলী-নিক্ষেপ," আর "বাজ ফেলা," কাব্য-শিল্পে সর্ব্বত্র সমশক্তি-সম্পন্ন নহে। ভাবটি যদি অস্পষ্ট গোছের না হয়, আর বাক্যটি যদি নিতান্ত দুর্ব্বল না হয়, তাহা হইলে শব্দাড়ম্বরে ভাবকে কখনই আচ্ছন্ন করিতে পারে না। আবার, ভাব যেখানে স্পষ্ট নয়, সেখানে সহজ শব্দও গাঢ় কুহেলিকা সৃষ্টি করিয়া থাকে। "কসুম-স্তবক" বলিলেই যে তাহার রূপ, রস, গন্ধ,—সমস্তই আচ্ছন্ন হইয়া গেল, আর "ফুলের তোড়া" বলিলেই সে সব ফুটিয়া উঠিল, ইহা কখনই হইতে পারে না। দুই-ই সমার্থবাচক হইলেও, রস-সৃষ্টিতে উহাদের পৃথক্- পৃথক্ স্থান। কোনটিই অবহেলার জিনিষ নয়; অথচ সকল স্থলেই দুইটি নির্ব্বিচারে ব্যবহৃত হইবারও নহে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অমিত্রচ্ছন্দ যথাবিধি আবৃত্তি করিতে না জানায় প্রথম-প্রথম এক শ্রেণীর লোক যেমন এই কাব্যের উপরে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, তেমনই আর-এক শ্রেণীর লোক ইহার শব্দাড়ম্বরে ভীত হইয়া এই কাব্যখানিকে ঐরূপ

* প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পরে, এক সময়ে সুপ্রসিদ্ধ আধুনিক দার্শনিক হেন্‌রী বার্গসোঁ (Henry Bergson) মহোদয়ের "Time and Freewill" নামক দার্শনিক গ্রন্থ আলোচনা করিতে-করিতে এক স্থলে যাহা পাইয়াছিলাম, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।———"The poet is he with whom feelings develop into images and the images themselves into words which translate them, while obeying the laws of rythm. In seeing these images pass before our eyes we in our turn experience the feeling which was, so to speak, their emotional equivalent."

শব্দাড়ম্বরের জন্যই নিন্দা করিয়াছেন, এবং এখনও এরূপ লোকের একান্ত অভাব নাই। রস-বোধ না থাকিলে, কাব্য পাঠে ঐরূপ বিড়ম্বনা হইবারই কথা। ভিন্ন-ভিন্ন রসের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কোথা করুণ-রসের গদ্গদশ্রু লোচন, শিথিলাবনত অঙ্গ ও ক্ষীণ স্বর।—আর কোথা রৌদ্র-রসের বজ্র-মুষ্টি, রোষ-কষায়িত নেত্র, দীর্ঘায়ত দেহ ও ভীম নাদ। শব্দমাত্র যাঁহার সম্বল, তিনি কি একই প্রকার শব্দ দ্বারা এই দুইটি বিভিন্ন প্রকারের ভাবকে মূর্ত্তিমন্ত করিতে পারেন? কাজেই উপযোগী শব্দের দ্বারাই শব্দ-চিত্রে বিভিন্ন রস ফুটাইতে হয়। বীর রৌদ্রাদিতে তদুচিত দুঃশ্রব শব্দের দ্বারাই সেই-সেই রসের স্বাভাবিক আড়ম্বরময়ী মূর্ত্তিটি ফুটাইয়া তুলিতে হয়। বাক্যে রস মূর্ত্তি-গঠনে ইহাই স্বাভাবিকতা এবং সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহাই উপদিষ্ট। অলঙ্কার-শাস্ত্র-মতে বীর রৌদ্রাদিতে শব্দের "দুঃশ্রবত্ব" গুণ বলিয়া গণ্য।—

> রৌদ্রাদৌ তু রসেঽত্যন্ত দুশ্রবত্বং গুণো ভবেৎ।'—(সাহিত্যদর্পণ)
> টীকা—"আদি শব্দাৎ বীর বীভৎসয়োগ্র হণম্।"

এই কাব্যে বীর, রৌদ্র, অদ্ভুতাদি রসে কবি রসোপযোগী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই, তাঁহার কবিতা এমন ওজোগুণান্বিত হইয়াছে এবং অমিত্রচ্ছন্দের স্বাধীনতায় ঐ ওজোগুণ যথেষ্ট পরিপুষ্ট ও প্রসারিত হইতে পারিয়াছে।

আবার, যে রসে শব্দাডম্বর অশোভন, শব্দাডম্বর যে রসকে নষ্ট করে, সেই করুণ ও শান্ত রসে কবির ভাষা কেমন আড়ম্বর-হীন ও রসোপযোগী। সীতা ও সরমার কথোপকথনের ভাষা কি সরল, সহজ ও স্বাভাবিক। বীর-রসে যিনি লিখিয়াছেন—"গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী," তিনিই আবার করুণরসে লিখিয়াছেন—"পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে ছিনু সুখে।' শোকে যখন শব্দাডম্বর থাকে না, তখন করুণ-রসের কবিতায় তাহা থাকিলে সাজিবে কেন? ইহাই স্বাভাবিকতা, এবং স্বাভাবিকতাই কাব্য-কলার হিসাবে সুন্দর। "লো সহচরি, এতদিনে আজি ফুরাইল জীব-লীলা জীব-লীলা স্থলে আমার।" ইহা শোক প্রকাশের সহজ ভাষা,—অশ্রুধারার সহিত বাহির হইয়াছে; এবং পাঠককেও অশ্রুধারায় সিক্ত করিয়া তুলে।

ছন্দের স্বাধীনতার সহিত শব্দ-সম্পদ না থাকিলে, ভাব-ব্যঞ্জনায় এমন সুন্দর স্বাভাবিকতা থাকিত না, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। অমিত্রচ্ছন্দের স্বাধীনতার সহিত এই অসামান্য শব্দ-সম্পদ যেমন বীর-রৌদ্রাদিতে ওজোগুণের প্রভাব বৃদ্ধি করিয়াছে, তেমনই করুণ-রসে সহজ ও সরল বাক্যের প্রয়োগ প্রসাদ-গুণের সহায় হইয়াছে। এই রসোপযোগী বাক্য-প্রয়োগেই মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দের আর-এক মনোহারিত্ব। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এক শ্রেণীর বিজ্ঞ সমালোচকেরা এ কাব্যে রস-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্রই জলের মত প্রাঞ্জল ভাষা নাই বলিয়া দোষ ধরেন এবং অধিকতর দুঃখের বিষয় যে, সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রজ্ঞ কোন-কোন পণ্ডিত-সমালোচকও বাঙ্গালা-কাব্যে বীররৌদ্রাদি রস-ব্যঞ্জনায় "পাখী সব করে রব"-এর মত ভাষা চাহেন। *

মধুসূদনের শব্দ-সম্পদের কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে ইহাও বলা আবশ্যক যে, তিনি যে শুধু সংস্কৃত শব্দ ভাণ্ডার হইতে রসোপযোগী শব্দ চয়ন করিয়া কাব্য-রসের পুষ্টি করিয়াছেন, তাহা নহে; ইংরাজীর অনুকরণেও তিনি অনেক পদ গঠন করিয়া কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন। Hope of Troyএর আদর্শে "রাক্ষস-ভরসা" সুন্দর! এইরূপ "রাঘব-বাঞ্ছা," "কেশব-বাসনা," "অমর-ত্রাস" ইত্যাদি। আবার, উপযুক্ত স্থলে তিনি সংস্কৃতের অনুকরণে দীর্ঘ-সমাস-ঘটিত পদও ব্যবহার করিতে

---

* এই স্থলে বিশ্ব-বরেণ্য কবি রবীন্দ্র নাথের "আধুনিক সাহিত্য" হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি—"বাংলার যে ছন্দে যুক্ত অক্ষরের স্থান হয় না, সে ছন্দ আদরণীয় নহে। কারণ, ছন্দের ঝঙ্কার এবং ধ্বনি-বৈচিত্র্য যুক্ত অক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে। একে বাংলা ছন্দে স্বরের দীর্ঘ-হ্রস্বতা নাই, তার উপরে যদি যুক্ত অক্ষর বাদ পড়ে, তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিবিহীন সুললিত শব্দপিণ্ড হইয়া পড়ে। তাহা শীঘ্রই শ্রান্তিজনক তন্দ্রাকর্ষক হইয়া উঠে, এবং হৃদয়কে আঘাত পূর্ব্বক ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র সঙ্গীত তরঙ্গিত হইতে থাকে, তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘ-হ্রস্বতা এবং যুক্ত অক্ষরের বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটী অবগত ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি এবং তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।"

কুণ্ঠিত হয়েন নাই ; অথচ সুপাঠকের মুখে তাহা অনেক স্থলেই শ্রবণ-সুখকর হইয়াছে। "কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী," "দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত" পড়িতে কাব্য-পাঠকের রদোভঙ্গ হইবার কথা নহে, কাব্য-শ্রোতার কানেও মন্দ শুনাইবার কথা নহে। ইহা ছাড়া, তিনি বিস্তর ক্রিয়াপদ গঠন কবিয়া গিয়াছেন, যেগুলি কবিতায় ব্যবহারেব বিশেষ উপযোগী। ইংরেজীতে বিস্তর বিশেষ্য-বিশেষণ পদ হইতে ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন দেখা যায়। ইহাতে শব্দ-সম্পদের শ্রীবৃদ্ধিই হইয়া থাকে। মধুসূদনও ঐরূপ বিস্তর ক্রিয়াপদ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন ;—তাহাতে কথার সংক্ষেপ হওয়ায় সেগুলি কবিতায় ব্যবহারের উপযোগী হইয়াছে। এইরূপ ক্রিয়াপদেব ব্যবহাব বাঙ্গালা-কাব্যে যে একেবারেই ছিল না, তাহা নহে। প্রাচীন কাব্যাদিতে নানা স্থলে ইহার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। "নির্ম্মিল," "নিবারিবে," "নিবাব," "জিজ্ঞাসয়ে"—এ সব ত আছেই ; তাহা ছাড়া, "মোহিলা", "বুড়াইলে", —এমন কি, "কুলুপিল" ভাবত চন্দ্র ব্যবহার কবিয়াছেন। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে "কটাক্ষিয়া" "গানে" (গান করে) পাওয়া যায়। কাশীরামের মহাভারতে "ত্যাগিতে", "ভেটিবে", "সমর্পে", "ভং র্সিয়া", আছে। মধুসূদন এই আদর্শে বিস্তব ক্রিয়াপদ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। নূতন বলিয়া "স্তুতিলা", "স্বনিলা" "নির্ঘোষিলা" ইত্যাদি প্রথম-প্রথম কানে একটু লাগিত বটে ; কিন্তু অভ্যাস-গুণে আর লাগে না। "কুজন করিল" স্থলে "কুজনিল", "প্রভাত হইল" স্থলে "প্রভাতিল", "প্রফুল্ল হইল" স্থলে "প্রফুল্লিল", "ছট্‌ফট্ করিয়া" স্থলে "ছট্‌ফটি", "তাপিত হইয়া", স্থলে "তাপি", "শান্ত হইল" স্থলে "শান্তিল", "নির্বীব করিবে" স্থলে "নির্বীরিবে"—এ সবেব দ্বারা কাব্যোচিত শব্দ-সম্পদেব শ্রীবৃদ্ধিই হইয়াছে। বার-বার 'করিল' "হইল" বা "করিয়া", "হইয়া" কবিতায় ভাল শুনাইত না। "হ্রাসো বসুধার ভাব" কবিতার ভাষায় শুনিতে সুন্দর। তাই বলিতেছি, মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দের ভাষার ইহাও এক বিশেষত্ব।

তৃতীয়তঃ—মধুসূদনেব অমিত্রচ্ছন্দের আর-এক বিশেষত্ব বাক্য-বিন্যাসে। গদ্যে বাক্য-বিন্যাস অনেক স্থলেই ব্যাকরণানুযায়ী ; ব্যাকরণ যেখানে যে কারকের স্থান-নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, সাধারণতঃ সেই নিয়ম রক্ষা করিয়া লিখিলেই সুন্দর গদ্য রচনা

হয়। কিন্তু কবিতা ভাবের ভাষা। ভাব যে-ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাই সেই ভাবের স্বাভাবিক ভাষা। এখানে ব্যাকরণের নির্দ্দেশ খাটে না। সকল প্রকার কবিতাতেই সেইজন্য বাক্য-বিন্যাস ভাবানুযায়ী; এমন কি, প্রবল ভাবকে ফুটাইতে গদ্যেও অনেক সময়ে ব্যাকরণের নির্দ্দেশ না মানিয়া, ভাবের ভাষাতেই ভাবকে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও, মিত্রাক্ষরচ্ছন্দে মিলের খাতিরে এবং দুই চরণে ভাব শেষ করিতে গিয়া, ভাবের ভাষা অনেক স্থলেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং বাক্য-বিন্যাসও সব-সময়ে ভাবানুযায়ী না হইয়া স্বাভাবিকতা হারায়। বন্ধন থাকিলেই ইহা অবশ্যম্ভাবী। যে-কোন কবির মিত্রাক্ষরচ্ছন্দী কবিতায় ইহার ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কিন্তু মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দে সে সঙ্কোচনের প্রয়োজন নাই—দুই চরণে ভাবের শেষ করিতেই হইবে, তাহা নহে—এবং চরণে-চরণে মিল রাখিতে হইবে, তাহাও নহে। সুতরাং ভাব সেই-ভাবোচিত স্বাভাবিক বাক্য-বিন্যাসের সহিত ফুটিয়া উঠিতে পাইয়াছে। বাক্য-বিন্যাসের এই স্বাভাবিকতা-গুণে মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দে সকল রসই সুখাস্বাদ্য। এই বাক্য-বিন্যাসের গুণেই তাঁহার বীর-রসে প্রাণ উদ্দীপিত হয়, রৌদ্র-রসে রৌদ্র-মূর্ত্তি যেন চক্ষের সমক্ষে প্রতিভাত হয়, ভয়ানকে হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করে এবং করুণে অশ্রুর উৎস খুলিয়া যায়।—

——"হায়, লঙ্কাপতি,
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব্ব কাহিনী?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা?
মদকল করি যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল-মাঝে,
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে!— (প্রথম সর্গ)

এখানে বাক্য-বিন্যাস কেমন স্বাভাবিক! মিলের বন্ধন নাই, যতির খাতির নাই; লোকে ভাবের ভাষায় যাহার পরে যে-কথাটি বলে, সেইরূপ স্বাভাবিক

বাক্য-বিন্যাসে ভগ্নদূত কহিতেছে। বাক্যের এই স্বাভাবিক বিন্যাস মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দের চমৎকারিত্বের এক নিগূঢ় রহস্য।

আবার দেখুন ;—

"রুষিলা দানব-বালা প্রমীলা রূপসী ;—
"কি কহিলি, বাসন্তি ? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি'
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?
দানব-নন্দিনী আমি ; রক্ষঃকুল-বধূ ;
রাবণ শ্বশুর মম ; মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ?" -(তৃতীয় সর্গ)

এখানে রোষের ভাষায় বাক্য-বিন্যাস চমৎকার স্বাভাবিক হইয়াছে ;—যে কথাটীর পরে যে কথাটী স্বাভাবিক, ঠিক তাহাই হইয়াছে। ছন্দের স্বাধীনতা না থাকিলে, সুকবির পক্ষেও সব সময়ে এইরূপ রসানুযায়ী বাক্য-সমাবেশের স্বাভাবিকতা রক্ষা করা সুকঠিন।

আরও দেখুন ;—

"সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে,
ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তি !"—(পঞ্চম সর্গ)

এখানে, প্রথমেই "সবিস্ময়ে" পাঠককে সচকিত করিয়া, শেষে "ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তি" বলায় ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তিটী যেন পাঠকের মনে স্থায়িভাব ধারণ করিয়া অদ্ভুত-রসটীকে গাঢ় করিয়া তুলিয়াছে। "ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তি সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে" বলিলে রসের পাক একটু কাঁচা থাকিয়া যাইত। কবি প্রথমে একস্থলে লিখিয়াছিলেন ;—

"শুনিলা চমকি' বীর ঘোর সিংহ-নাদ।"—(পঞ্চম সর্গ)

পরে ২য় সংস্করণে পরিবর্ত্তিত করেন

"ঘোর সিংহনাদ বীর শুনিলা চমকি'।"— (ঐ)

বাক্য-সমাবেশের গুণে প্রথমটী অপেক্ষা দ্বিতীয়টী অধিকতর বিস্ময়-ভাব-ব্যঞ্জক, ইহা রসজ্ঞ পাঠককে আর বুঝাইতে হইবে না। অমিত্রচ্ছন্দে কবি অবাধ বলিয়া রসোৎকর্ষক বাক্য সমাবেশে তাঁহার এমন স্বাধীনতা।

করুণ-রসের অভিব্যক্তিতেও বাক্য-বিন্যাসের ঐরূপ সুন্দর স্বাভাবিকতা বিদ্যমান্। সেইজন্য মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দ করুণ-রসেও চমৎকার রসোৎকর্ষক হইয়াছে।

"রাজ্য ত্যজি বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীর-দ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনুঃ করে, হে সুধন্বি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি, আজি রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি-মাঝে আমি,
বিপদ-সলিলে মগ্ন; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম?"—ইত্যাদি———— অষ্টম সর্গ)

ইহা পড়িবার সময়ে মনে হয় না যে, কবির ছন্দোবদ্ধ রচনা পড়িতেছি,—মনে হয়, যেন সত্য-সত্যই লক্ষ্মণের জন্য কাঁদিয়া-কাঁদিয়া সুভ্রাতৃবৎসল রাম শোক-প্রকাশ করিতেছেন;—বাক্যের সমাবেশ এমনই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকত্বেই ইহার মনোহারিত্ব!

—"লো সহচরি, এতদিনে আজি
ফুরাইল জীব-লীলা জীব-লীলা-স্থলে
আমার! ফিরিয়া সবে যাও দৈত্য-দেশে!
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি!"——— (নবম সর্গ)

করুণ-রসের এই অভিভাষণে বাক্য-বিন্যাসের স্বাভাবিকতাই ইহার সৌন্দর্য্য-রহস্য। অধিক উদাহরণ দেওয়া অনাবশ্যক। কাব্যের প্রায় সর্ব্বত্রই বাক্য-বিন্যাসের এইরূপ মনোহারিত্ব জাজ্জ্বল্যমান্।

চতুর্থতঃ—মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দের আর-এক বিশেষত্ব, সংযত-ভাবে অনুপ্রাস ব্যবহারে। মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই আর-এক মধুসূদন, * দাশরথি এবং অন্যান্য কবিগণ অনুপ্রাসের এত ছড়াছড়ি করিয়া গিয়াছেন যে, এখন তাহার প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাই। কিন্তু মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দী কবিতার সংযত অনুপ্রাস পাঠকের কানে মিত্রাক্ষরের মিলের অভাবটী সুন্দর রূপে পূরণ করিয়াছে। তিনি নিজেই তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—"I have used more "অনুপ্রাস" and "যমক" than I like; but I have done so to deceive the ear, as yet unfamiliar with blank verse."

কোন-কোন স্থলে একটু দীর্ঘ অনুপ্রাস আছে বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অনুপ্রাস ঠিক যেন অলঙ্কারে "ডায়মন্"-কাটার মত সর্ব্বত্র ঝক্-ঝক্ করিতেছে এবং তাহাতে কবিতাও উজ্জ্বল হইয়াছে।

"বন্দি চরণারবিন্দ অতি মন্দমতি"—(১ম সর্গ)

"কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে—"হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি সখি।"———————(৪র্থ সর্গ)

"কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে"—(ঐ)

এই-সকল ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অনুপ্রাসে কবিতার আস্বাদ যেন সুপাচকের হাতে মিষ্ট-দেওয়া ব্যঞ্জনের আস্বাদের মত। মিষ্ট দেওয়া হইয়াছে বলিয়া স্পষ্ট বোধ হয় না; অথচ আস্বাদের উৎকর্ষ হয়! ইহাতে মিত্রাক্ষরের মিষ্টত্বের স্থান সুন্দর পূরণ করিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত ঐ-সকল গুণগুলি একত্র হইয়া মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দী কবিতাকে সুস্বাদু, সুশ্রাব্য ও মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। রসানুযায়ী শব্দ-প্রয়োগে ও

---

* প্রসিদ্ধ টপ-সঙ্গীত-প্রণেতা মধুসূদন কিন্নর, যিনি "মধুকান" নামে প্রসিদ্ধ।

স্বাভাবিক বাক্য-বিন্যাসে উহা সজীবতাময়; ভাবানুযায়ী যতিতে উহা স্বাভাবিক অথচ সঙ্গীত-স্বাদ-বিশিষ্ট; এবং সংযত অনুপ্রাসে উহা সুমিষ্ট ও মনোহর।

ইংলণ্ডের কবিবর টেনিসন্ কবীন্দ্র মিলটন্‌কে "Organ Voice of England" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মধুসূদনের মেঘনাদ-বধ কাব্যকেও বাঙ্গালার মৃদঙ্গ-নাদ বলিয়া অভিহিত করিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। সর্ব্বাংশে ক্ষীণ জাতির উন্নতি-কল্পে এরূপ কাব্য সবিশেষ উপকারী ও আশাপ্রদ। উহার ভাষা পুরুষোচিত সবল ও দৃঢ়; উহার প্রকাশভঙ্গি সহজ ও সুস্পষ্ট; এবং উহার পরিপূর্ণ ধ্বনি গাম্ভীর্য্যে, লয়ে ও ঝঙ্কারে বস্তুতই হৃদয়োন্মাদক। জাতি-গঠনে এরূপ কাব্যের যথেষ্ট সার্থকতা না থাকিয়াই পারে না। গীতি-কাব্যাদির স্ত্রীজনোচিত কোমলতা ও অর্দ্ধনিমীলিত প্রকাশ-ভঙ্গির সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই, এ কথার যাথার্থ্য সুস্পষ্ট-রূপে প্রতীয়মান্ হয়।

ছন্দের মনোহারিতা আবৃত্তিতে। ছেদের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, ভাবের দিকে মন রাখিয়া, স্থলে-স্থলে হ্রস্ব-দীর্ঘের মাত্রাভেদ-অক্ষুণ্ণ এবং সর্ব্বত্রই চরণের শেষে (যদি পূর্ণচ্ছেদ না থাকে) একটা টান রাখিয়া এই ছন্দের আবৃত্তি অভ্যাস করিতে হয়। রীতিমত আবৃত্তি হইলেই বুঝা যায়, এই ছন্দ রসের কিরূপ উৎকর্ষক। তখন এবং তখনই উপলব্ধি হয় যে, অমিত্রচ্ছন্দ বাস্তবিকই "noblest measure in the language" এবং মধুসূদনের হাতে এই ছন্দের কেমন মর্য্যাদা রক্ষা হইয়াছে, তাহা একজন বাঙ্গালা-সাহিত্যে সুপণ্ডিত ইংরেজ বলিয়াছেন;—

"Bengali verse can also be nobly and impressively rhetorical as in the magnificent epic of Madhusudan." *Chhanda or metre by J. D. Anderson—The Modern Review, Sep—1916*

অলঙ্কার

বঙ্গ সাহিত্যের প্রাচীন-মহাকাব্যগুলি প্রায়শঃ সংস্কৃত-কাব্যাদির আদর্শে রচিত বলিয়া নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত। কৃত্তিবাসের রামায়ণে, কাশীরামের মহাভারতে, রঘুনন্দনের রাম-রসায়নে অলঙ্কারেব প্রাচুর্য্যই লক্ষিত হয়। এ বিষয়ে মধুসূদনও সংস্কৃত-কাব্যাদির আদর্শে অলঙ্কার প্রয়োগ করিতে এবং তাহাদের পারিপাট্য-সাধনে বরং অন্যান্য বঙ্গীয় কবি অপেক্ষা সমধিক যত্নশীল। শুধু "মেঘনাদ-বধ" নহে, তাঁহার অন্যান্য কাব্যগুলিও নানাবিধ অলঙ্কারে মণ্ডিত। এইজন্য তাঁহার এই শ্রেষ্ঠ কাব্যখানির ভূমিকায় অলঙ্কার-সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

সংস্কৃত-অলঙ্কার-শাস্ত্রে কাব্য পুরুষ-রূপে কল্পিত। শব্দ ও অর্থ তাহার দেহ। ঐ দেহের নানাবিধ ভূষণগুলি "অলঙ্কার" নামে অভিহিত। "কাব্যস্য শব্দার্থৌ শরীরম্, রসাদিশ্চাত্মা, গুণাঃ শৌর্য্যাদিবৎ, দোষাঃ কাণত্বাদিবৎ, রীতয়োঽবয়ব-সংস্থান-বিশেষবৎ, অলঙ্কারাস্তু কটক কুণ্ডলাদিবৎ।" শব্দ ও অর্থ কাব্য পুরুষের শরীর ; রস আত্মা ; গুণ শৌর্য্যাদির ন্যায় ; দোষ কাণত্ব-খঞ্জত্বাদির ন্যায় ; রীতি অবয়ব-সংস্থানবৎ এবং অলঙ্কার বলয়-কুণ্ডলাদিবৎ। বাস্তবিক, দেহের শোভাবর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত যেমন নানাবিধ ভূষণের ব্যবহার, তেমনি বাক্যের শব্দার্থের চমৎকারিত্বের এবং ভাব ও রসের সৃষ্টি ও পুষ্টির নিমিত্ত নানাবিধ রচনা-চাতুর্য্যের সৃষ্টি। দৈহিক ভূষণের ন্যায় সাহিত্যেও সেগুলি "অলঙ্কার" বলিয়া প্রসিদ্ধ। যেমন ভাষাকে নিয়ম-বদ্ধ করিয়া ব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি ঐ-সকল রচনাভঙ্গিকে শ্রেণিবদ্ধ ও নিয়মিত করিয়া অলঙ্কার-শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। সংস্কৃত-সাহিত্যে, বিশেষতঃ সংস্কৃত-কাব্য-সাহিত্যে বিবিধ-প্রকারের রচনা-চাতুর্য্য যত প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়, বোধ হয়, তত আর কোনও সাহিত্যে নয়, এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং, সংস্কৃত সাহিত্য অবলম্বনে এমন সুবিপুল অলঙ্কার-শাস্ত্র গঠিত হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে

হয়। ভাবকে ফুটাইবার ও রসের পুষ্টির নিমিত্ত যত প্রকার ভঙ্গি আছে বা হইতে পারে, সকলই যেন তাহাতে স্থান পাইয়াছে। এমন কি, বিশেষ-বিশেষ দোষ-গুলিও বিশেষ-বিশেষ নামে অভিহিত হইয়া আলোচিত হইয়াছে। এজন্য, সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রবেশ করিতে গেলে যেমন প্রথমেই ব্যাকরণ উত্তমরূপে জানিতে হয়, সেইরূপ সংস্কৃত-কাব্য পড়িবার পূর্ব্বে পাঠার্থীকে ব্যাকরণের সহিত অলঙ্কার-শাস্ত্রও পড়িতে হয়। বাঙ্গালা কাব্যে সংস্কৃতের মত, অলঙ্কারের বাহুল্য না থাকিলেও, প্রধান-প্রধান অলঙ্কারগুলির ব্যবহার উৎকৃষ্ট কাব্যগুলিতে নিতান্ত অপ্রচুর নহে। বিশেষতঃ, মধুসূদনের কাব্যগুলিতে বহুবিধ অলঙ্কারের প্রয়োগ সুপ্রচুরই বলিতে হয় এবং অনেক স্থলেই তিনি সংস্কৃতের আদর্শে অলঙ্কারগুলির পারিপাট্য-সাধনে অন্যান্য কবিদিগের অপেক্ষা সমধিক মনোযোগী। তাঁহার ব্যবহৃত অলঙ্কারগুলি সকল-স্থলেই অলঙ্কার-শাস্ত্রানুসারে নির্দ্দোষ না হইলেও, অধিকাংশ স্থলেই সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। একেবারে অলঙ্কার-দোষ-বর্জ্জিত কাব্য সংস্কৃতেও বিরল, বাঙ্গালা কাব্যের ত কথাই নাই। অলঙ্কার-শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিচারে সংস্কৃতে কোন কবিরই নিস্তার নাই। মহাকবি কালিদাসও আলঙ্কারিকের হাত এড়াইতে পারেন নাই। এমত স্থলে, মধুসূদনের এ কাব্যেও যে স্থানে-স্থানে অলঙ্কার-দোষ লক্ষিত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? যাহা হউক, দোষ থাকিলেও এমন একখানি অলঙ্কারবহুল কাব্যের রসাস্বাদ করিতে হইলে, অলঙ্কার-সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক। সেইজন্য আমি নিম্নে এই-কাব্যে ব্যবহৃত প্রধান-প্রধান অলঙ্কারগুলির উল্লেখ ও তাহাদের লক্ষণাদি নির্দ্দেশ করিয়া উদাহৃত করিতেছি। পাঠক-পাঠিকাগণ সেই সেই নির্দ্দেশানুসারে কাব্যের কোথায় কি অলঙ্কার, নিজেরাই অনুসন্ধান করিয়া লইবেন। প্রত্যেক স্থলে আমার উল্লেখ করা অপেক্ষা, তাঁহাদের নিজেদের অনুসন্ধানই বাঞ্ছনীয়।

শব্দ ও অর্থ কাব্যের শরীর; সুতরাং অলঙ্কারও দ্বিবিধ : শব্দালঙ্কার ও **অর্থালঙ্কার**।

শব্দালঙ্কার

যাহা দ্বারা শব্দের চমৎকারিত্ব সাধিত হয়, তাহাই শব্দালঙ্কার; যথা অনুপ্রাস-যমকাদি। এ কাব্যে অনুপ্রাস ভিন্ন অন্য শব্দালঙ্কার প্রায় নাই; কেবল কোথাও-কোথাও "কাকু" দৃষ্ট হয় মাত্র।

অনুপ্রাস—বাক্যের মধ্যে একই ব্যঞ্জন-বর্ণের বারংবার বিন্যাসকে অনুপ্রাস বলে। শব্দের চমৎকারিত্ব সাধন করে বলিয়া ইহা শব্দালঙ্কার। সংস্কৃত-অলঙ্কার-শাস্ত্রে পঞ্চবিধ অনুপ্রাস উল্লিখিত হইয়াছে—ছেকানুপ্রাস, বৃত্তানুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস ও লাটানুপ্রাস। এ কাব্যে প্রথম দুই প্রকার অনুপ্রাসের ব্যবহার আছে।

ছেকানুপ্রাস—শব্দের ব্যঞ্জন-সমূহ যথাযথ পুনরুচ্চারিত হইলে ছেকানুপ্রাস হয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যে ও দাশরথির পাঁচালীতে ইহার বহুল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ কাব্যে ক্বচিৎ দুই-এক স্থলে দেখা যায়; যথা—

"দুর্দ্দান্ত দানবে দলি, নিস্তারিলা তুমি
দেব-দলে, নিস্তারিণি; নিস্তার অধীনে,
মহিষমর্দ্দিনি, মর্দ্দি দুর্ম্মদ রাক্ষসে।"—(ষষ্ঠ সর্গ)

এখানে, "নিস্তার" শব্দের ব্যঞ্জন-সমূহ তিনবার এবং "মর্দ্দি" শব্দের ব্যঞ্জন-দ্বয় দুইবার পর্য্যায়-ক্রমে উচ্চারিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, এখানে বৃত্তানুপ্রাসের মিশ্রণও আছে—

"বাহিরিল বেগে
বারী হ'তে (বারি-স্রোতঃসম পরাক্রমে
দুর্ব্বার) বারণ-যূথ,"— (প্রথম সর্গ)

এখানে, 'ব' ও 'র' যথাক্রমে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইয়াছে।

বৃত্তানুপ্রাস—পর্য্যায়-ক্রমেই হউক, আর অপর্য্যায়-ক্রমেই হউক, একরূপ ব্যঞ্জন-বর্ণের বারংবার উল্লেখকে বৃত্তানুপ্রাস বলে। বাঙ্গালায় সর্ব্বত্রই ইহার প্রচুর প্রচলন। এ কাব্যেও সেইরূপ। উপরি-উক্ত উদাহরণে দ, ন, স্ত, ম, র্দ্দ, এই কয়েকটির পুনঃ-পুনঃ উচ্চারণে বৃত্তানুপ্রাস হইয়াছে। গদ্যে, পদ্যে, সর্ব্ববিধ রচনাতেই ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয় এবং সংযত-ভাবে ব্যবহৃত হইলে, রচনা সবিশেষ সমাদৃতই হইয়া থাকে। এ কাব্যে প্রায় ছত্রে-ছত্রে এই অলঙ্কার বিরাজ করিতেছে এবং প্রায় সর্ব্বত্রই ইহা সংযত-ভাবে ব্যবহৃত ;—

"দেউল-দুয়ারে দোঁহে দাঁড়ায়ে দেখিলা".—(১ম সর্গ)
"শত-শত হেন যোধ হত এ সমরে।"— (ঐ)
ভবেশ-ভাবিনী ভাবিলা কি ভাবে আজি
ভেটিব ভবেশে" ———————— (২য় সর্গ)
"ভয়ে ভগ্নোদ্যম আমি ভাবিয়া ভবেশে"— (ঐ)
"চল রঙ্গে মোর সঙ্গে, নির্ভয় হৃদয়ে
অনঙ্গ' ———————————— (ঐ)
"একাকিনী শোকাকুলা অশোক-কাননে
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে।"— (৪র্থ সর্গ)
"কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে'— (ঐ)

কয়েক স্থলে ঐরূপ দীর্ঘ অনুপ্রাস দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহা ছাড়া, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অনুপ্রাস এ কাব্যের সর্ব্বত্র বিরাজমান্ থাকায় এই কাব্যের শব্দ-সৌন্দর্য্য অতুলনীয় হইয়াছে। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অনুপ্রাস তত জোরে কানে লাগে না ; অথচ বাক্যের শ্রুতি-মাধুর্য্যে মন মুগ্ধ হয় ;—

"শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি সিংহীরে !
কে তোরে রক্ষিবে, রক্ষ ? পড়িলি সঙ্কটে,
লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারী-রতনে।"—(৪র্থ সর্গ)

এখানে, অনুপ্রাসগুলি কেমন স্নিগ্ধভাবে শব্দ-চমৎকারিত্ব সাধন করিয়াছে !

যেখানে কঠিন-কঠিন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে অনুপ্রাস দিয়া তাহার শ্রুতি-কঠোরতা যতদুর সম্ভব দূর করা হইয়াছে ; পূর্ব্বোদ্ধৃত "দুর্দ্দান্ত দানবে দলি" ইত্যাদি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কোথাও সুবিন্যস্ত অনুপ্রাসে বর্ণিতব্য বিষয়টী কেমন সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত ;—

"গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী"—(৩য় সর্গ)

পড়িতে পাঠকের কানে কাদম্বিনী-নাদটী যেন ধ্বনিত হইয়া উঠে। ইহাকেই ইংরাজীতে বলে, "Sound echoes the sense." Onomatopoetic.

কাকু—স্বরভঙ্গি দ্বারা কাব্যার্থ প্রকাশ করা ; যথা—

"কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ?——(৪র্থ সর্গ)

কেহই পদ্মের পর্ণ (পাঁপড়ি) ছিঁড়িয়া পদ্মের শোভা নষ্ট করে না ; তবে সীতা-পদ্মের অলঙ্কার-রূপ পর্ণ রাবণ কেন ছিঁড়িল ? ইহাই এখানে "কে ছেঁড়ে"—এই স্বরভঙ্গি দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে।

"ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে ?"—(৪র্থ সর্গ)

এখানে, অশোক-কানন-রূপ সমল সলিলে কি কভু সীতা-কমলের কমল-শ্রী ফোটে ?—ইহাই স্বরভঙ্গি দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

ঐরূপ—

——"হুতাশন-তেজে
গলে লৌহ, বারিধারা দমে কি তাহারে ?
অশ্রুবিন্দু মানে কি, লো, কঠিন যে হিয়া ?"—(৪র্থ সর্গ)

অর্থালঙ্কার

যাহার দ্বারা অর্থের চমৎকারিত্ব, ভাবের পরিস্ফুটন ও রসের পুষ্টি হয়, তাহাই অর্থালঙ্কার; যথা উপমা, রূপকাদি। অর্থালঙ্কার বহুবিধ এবং এ কাব্যে প্রায় সকল প্রকার অর্থালঙ্কারগুলিরই ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

উপমা—(উপ+মা অর্থাৎ মাপারই মত)। কোন বিষয়ে সমান-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট দুইটি পদার্থের সাদৃশ্য প্রদর্শন করাকে উপমা বলে। সুতরাং উপমার দুই অঙ্গ;—উপমেয় ও উপমান। যাহার উপমা দেওয়া হয়, তাহা উপমেয় এবং যাহার সহিত উপমা দেওয়া হয়, তাহা উপমান। উপমায় যথা, ন্যায়, সম, সমান ইত্যাদি তুলনা-বাচক শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে।

অলঙ্কারের মধ্যে উপমাই প্রধান বলিয়া পরিগণিত। রূপক, উৎপ্রেক্ষাদি অন্যান্য প্রধান অলঙ্কারগুলি উপমারই একপ্রকার রূপান্তর মাত্র। এ কাব্যে এবং সকল কাব্যেই সেইজন্য উপমারই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এ কাব্যে উপমা ত প্রায় ছত্রে-ছত্রে, বলিলেও চলে।

পূর্ণোপমা—যেখানে উপমান, উপমেয়, সাধারণ ধর্ম্ম ও উপমা-বাচক 'যথাদি' শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ থাকে, সেখানে পূর্ণোপমা;—

> "নৃমুণ্ডমালিনী দূতী, নৃমুণ্ডমালিনী—
> আকৃতি, পশিয়া ধনী অরিদল-মাঝে
> নির্ভয়ে চলিলা, যথা গরুত্মতী তরী
> তরঙ্গ-নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা
> অকূল সাগর-জলে চলে-একাকিনী।"—(৩য় সর্গ)

এখানে, উপমার বিষয়ীভূত সমস্ত উপাদানগুলি—উপমান, উপমেয় ও উভয়ের সাধারণ ধর্ম্ম এবং 'যথা' শব্দ—স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া, ইহা পূর্ণোপমার দৃষ্টান্ত-স্থল।

মধুসূদন সংস্কৃতের আদর্শে উপমান-উপমেয়ের সমলিঙ্গতা, এমন কি, কোথাও-কোথাও সমবচনতাও রক্ষা করিতে যত্নশীল ;—

"চমকিলা বীর-বৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশাকালে
হেরি অগ্নিশিখা ঘরে ———(৩য় সর্গ)

এখানে, উপমেয় "বামার" সহিত উপমান "অগ্নিশিখা"র সমলিঙ্গতা, সুন্দর রক্ষিত হইয়াছে। এইরূপ, উপমান-উপমেয়ের সমলিঙ্গতা, মেঘনাদবধ-কাব্যে অনেকস্থলেই দৃষ্ট হয়।

"পশিলা বীরেন্দ্র-বৃন্দ বীরবাহু-সহ
রণে যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।"—(১ম সর্গ)

এখানে, "যূথনাথ" ও "বীরবাহু" এবং "গজযূথ" ও "বীরেন্দ্র-বৃন্দ", উভয় স্থলেই উপমান-উপমেয়ের, সমবচনতা রক্ষিত হইয়াছে।

লুপ্তোপমা—যেখানে উপমান, উপমেয়, উভয়ের সাধারণ ধর্ম্ম এবং উপমা-দ্যোতক 'যথাদি' শব্দ, ইহাদের কোন-একটি বা দুইটি লুপ্ত থাকে, সেখানে লুপ্তোপমা হয়।

"না বুঝে পা দিনু ফাঁদে ; অমনি ধরিল
হাসিয়া ভাসুর তব আমায় তখনি।"—(৪র্থ সর্গ)

এখানে, পক্ষী ফাঁদে পা দিলে, ব্যাধ যেমন আনন্দে তাহাকে ধরিয়া ফেলে,—এই ভাবটি লুপ্ত আছে, বুঝিতে হইবে—

"কোন্ কুলবধূ আজি হরিলি দুর্ম্মতি ?
কার ঘর আঁধারিলি নিবাইয়া এবে
প্রেম-দীপ ?"————————(৪র্থ সর্গ)

এখানে, উপমার দ্যোতক 'যথাদি' শব্দের প্রয়োগ নাই ; অথচ দীপ নিবাইয়া ঘর আঁধার করার সহিত গৃহস্থের প্রেম-দীপ-স্বরূপ কুলবধূকে হরণ করার উপমা দেওয়া হইয়াছে।

মালোপমা—(মালা+উপমা অর্থাৎ উপমা-মালা)। প্রস্তাবিত বিষয়ের সহিত একাধিক উপমা ; যথা —

"————————সিংহপৃষ্ঠে যথা
মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা ; ঐরাবতে শচী
ইন্দ্রাণী ; খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্র রমণী ,—
শোভে বীর্য্যবতী সতী বড়বার পিঠে" ;—(৩য় সর্গ)

অন্যত্র—

"মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমিরগর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকর-রাশি যথা) সূর্য্যকান্ত-মণি ;
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে।"—(৪র্থ সর্গ)

এক উপমেয়েব সহিত একাধিক লুপ্তোপমা থাকিলে, তাহাকে লুপ্ত মালোপমা বলা যাইতে পাবে ; যথা—

"—হায় সখি জানিতাম যদি
ফুলরাশি-মাঝে দুষ্ট কালসর্প-বেশে,
বিমল সলিলে বিষ",————(৪র্থ সর্গ)

প্রতিবস্তূপমা—'যথাদি' উপমা-বাচক শব্দের প্রয়োগ না করিয়া, সাধারণ ধর্ম্ম এক, এমন দুইটি বিষয়ের সাদৃশ্য কথন। 'যথাদির' প্রয়োগ থাকিলে উপমা এবং সাধারণ ধর্ম্ম এক হইলে প্রতিবস্তূপমা হইয়া থাকে ; যথা—

"যে রমণী পতি-পরায়ণা,
সহচরী-সহ সে কি যায় পতি-পাশে ?
একাকী প্রত্যূষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণকান্ত তার !"———(২য় সর্গ)

এখানে, পতিপরায়ণা রমণী ও চক্রবাকীর সাধারণ ধর্ম্ম এক এবং একাকী

পতি-পাশে গমনে উভয়ের সাদৃশ্য দেখান হইয়াছে; অথচ 'যথাদি' উপমা-বাচক শব্দের প্রয়োগ নাই।—

"———— চারিদিকে সখী-দল যত,
বিরস-বদন, মরি, সুন্দরীর শোকে!
কে না জানে, ফুলকুল বিরস-বদনা,
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী?"—(৩য় সর্গ)

এখানে, মেঘনাদের বিরহে প্রমীলা, মধুর বিরহে বনস্থলীর ন্যায়, তাপিতা এবং সখীগণও, ফুলকুলের ন্যায় বিরস-বদন। সুতরাং উপমান ও উপমেয়ের সাধারণ ধর্ম্ম এক দেখান হইয়াছে; অথচ 'যথাদি' শব্দের প্রয়োগ নাই।

রূপক—উপমান ও উপমেয়ে অভেদ-কল্পনা। ইহা উপমার রূপান্তর হইলেও, কবি-কল্পনার দিক্ হইতে ইহা উপমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।—

"পাবক-শিখা-রূপিণী জানকী"——(১ম সর্গ)

এখানে, "জানকী" ও "পাবক-শিখা" অভিন্ন-রূপে কল্পিত হইয়াছে।

"আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব?"———— ————(৪র্থ সর্গ)

সীতার পক্ষে রামের 'পা-দুখানি' আশা-রূপ সরোবরে 'রাজীব-স্বরূপ'। এখানে, "আশা" ও "সরোবর" এবং "সে পা-দুখানি" ও "রাজীব" অভিন্ন-রূপে কল্পিত।

"লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে"—(৬ষ্ঠ সর্গ)

এখানে লঙ্কা ও পঙ্কজ, মেঘনাদ ও রবি এবং মৃত্যু ও অস্তাচলে গমন, কবি-কল্পনায় অভিন্ন।

সাঙ্গ-রূপক—প্রস্তাবিত রূপকের উপমেয় ও উপমান অবলম্বন করিয়া যখন উভয়পক্ষেই উহাদের অন্যান্য অঙ্গও রূপকে কল্পিত হয়, তখন তাহাকে সাঙ্গ-রূপক বলে; যথা—

"শোকের ঝড় বহিল সভাতে।
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল, মুক্ত-কেশ মেঘমালা, ঘন
নিঃশ্বাস প্রবল বায়ু; অশ্রুবারিধারা
আসার, জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব।" (১ম সর্গ)

এখানে, প্রথমে শোক ও ঝড়কে অভিন্ন-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে।. তাহার পর, ঝড়ের অঙ্গ-স্বরূপ বিদ্যুৎ, মেঘ, প্রবল বায়ু, বারি-বর্ষণ ও মেঘ-গর্জ্জন যথাক্রমে বামাকুল, মুক্তকেশ, ঘন নিঃশ্বাস, অশ্রুবারিধারা ও হাহাকার-রবের সহিত অভিন্নরূপে কল্পিত হইয়া, একপক্ষে সাঙ্গ-উপমেয় ও পক্ষান্তরে সাঙ্গ-উপমান,—একত্রে সুন্দর সাঙ্গ-রূপক হইয়াছে।

এইরূপ কয়েকটি সাঙ্গ-রূপক এই কাব্যের স্থানে-স্থানে শোভা পাইতেছে;—এখানে গুটিকতক উদ্ধৃত করিলাম;—

"মেঘ-বর্ণ রথ, চক্র বিজলীর ছটা,
ধ্বজ ইন্দ্র-চাপ-রূপী; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি।"——— ———(১ম সর্গ)

এখানে, উপমেয়-পক্ষে রথ, চক্র, ধ্বজা ও তুরঙ্গম, এবং উপমান-পক্ষে যথাক্রমে মেঘ, বিজলী, ইন্দ্র-চাপ ও আশুগতির (বায়ুর) সহিত অভিন্নরূপে কল্পিত।

অন্যত্র—

"শরদিন্দু পুত্র, বধূ শারদ কৌমুদি" ইত্যাদি—(৫ম সর্গ)
"লঙ্কাধামে সাজিলা ভৈরবী
রক্ষঃকুল-অনীকিনী উগ্রচণ্ডা রণে।
গজরাজ-তেজঃ ভুজে! আশুগতি পদে" ইত্যাদি।—(৭ম সর্গ)

অলঙ্কারের মধ্যে সাঙ্গ-রূপক পরম উপাদেয়। বাঙ্গালা-সাহিত্যে ইহা কমই

দেখা যায়। এই কাব্যে কয়েক স্থলে চমৎকার সাঙ্গ-রূপক দেখিতে পাই। সেগুলি সংস্কৃত আদর্শ অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে।

মালা-রূপক—একই উপমেয় বস্তুকে একাধিক ভিন্ন-ভিন্ন উপমান দ্বারা রূপকিত করিলে মালা-রূপক হয়; যথা—

"মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ! সুশীতল ছায়া রূপ ধরি,
তপন-তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে।
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে!
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম! ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল-কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি!"—(৪র্থ সর্গ)

এখানে, লঙ্কায় সরমা সীতার পক্ষে, 'মরুভূমে প্রবাহিণী", তপন-তাপিতার পক্ষে "সুশীতল ছায়া" ইত্যাদি।

উৎপ্রেক্ষা—ইহা রূপকেরই ঈষৎ রূপান্তর। "যেন", "বুঝি" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে উপমেয়কে উপমান বলিয়া উৎকট সংশয় বা বিতর্ক। যথা;—

"ধরে ছত্র ছত্রধর, আহা,
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি',
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে!" (১ম সর্গ)

এখানে, উপমেয় "ছত্রধব"কে ছত্রধর-রূপী "কাম" (মদন) বলিয়া বিতর্ক।

"যেন তরু তাপি মনস্তাপে
ফেলিয়াছে খুলি সাজ;——(৪র্থ সর্গ)

এখানে, উপমেয় "তরু"কে মনস্তাপিত বলিয়া বিতর্ক।

সাঙ্গ-রূপকের মত উৎপ্রেক্ষাতেও উপমান ও উপমেয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সুন্দর উৎপ্রেক্ষিত হইতে পারে; যথা,—

"মানস-সকাশে শোভে কৈলাস-শিখর

আভাময় ; তার শিরে ভবের ভবন,
শিখিপুচ্ছ-চূড়া যেন মাধবের শিরে !
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর ; স্বর্ণফুলশ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি, পীতধড়া যেন !
নির্ঝর-ঝরিত বারিরাশি স্থানে-স্থানে
বিশদ চন্দনে যেন চর্চ্চিত সে বপু !" (২য় সর্গ)

এখানে, 'মাধবের' সহিত 'কৈলাসের' এবং তদঙ্গীভূত শিখিপুচ্ছ-চূড়া ইত্যাদির সহিত ভব-ভবনাদির, উৎপ্রেক্ষা।

এক টীকাকার এখানে "উপমা" বলিলেন কিরূপে ? স্থানান্তরে তিনি উৎপ্রেক্ষার লক্ষণ ঠিকই আওড়াইয়াছেন। তবে এখানে এমন স্থলে ভুল করিলেন কেন ?

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা—যেখানে "যেন", "বুঝি" ইত্যাদি উৎপ্রেক্ষা-বাচক শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ থাকে, সেখানে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা হয়। কিন্তু যেখানে উহা উহ্য থাকে, সেখানে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। যথা উপরি-উক্ত উদাহরণে "সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর"। এখানে "যেন" উহ্য বুঝিতে হয় বলিয়া প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা হইয়াছে।

মালা-রূপকের মত, একই উপমেয় বস্তুকে ভিন্ন-ভিন্ন উপমান-দ্বারা উৎপ্রেক্ষিত করিলে মালোৎপ্রেক্ষা হয় ; যথা—

"———দেখিলা অদূরে
দেবাকৃতি সৌমিত্রিরে, কুজ্ঝটিকাবৃত
যেন দেব ত্বিষাম্পতি, কিম্বা বিভাবসু
ধূমপুঞ্জে।"—————————(৬ষ্ঠ সর্গ)

এখানেও ঐ টীকাকার "মালোপমা" বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন।

অতিশয়োক্তি—উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া উপমানকেই উপমেয়-রূপে নির্দ্দেশ :যথা—

"হায় শূর্পণখা,

কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল-পঞ্চবটী-বনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে?"—————(১ম সর্গ)

এখানে, উপমেয় রামের উল্লেখ না করিয়া, যেন কালকূটে ভরা ভূজগকেই শূর্পণখা পঞ্চবটী বনে দেখিয়াছিল, এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

"দাসীর এ তৃষা তোর সুধা বরিষণে!"—(৪র্থ সর্গ)

এখানে সীতার বাক্যই উপমেয়। কিন্তু তাহার উল্লেখ না করিয়া "সুধা-বরিষণে" তৃষা তুষিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

"বন-সুশোভন শাল ভূপতিত আজি,
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবর-শিরে;
গগন-রতন-শশী চির-রাহু গ্রাসে!"—(৭ম সর্গ)

এখানে, উপমেয় মেঘনাদের উল্লেখ নাই। উপমান-ত্রয়ই উপমেয়-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

স্বভাবোক্তি—স্বভাবের বা বিষয়ের যথাযথ বর্ণনা। যথা—

"কিন্তু যে, গো, গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক।"—————(১ম সর্গ)

এখানে, মাতৃ-প্রকৃতির যথাযথ বর্ণনাই করা হইয়াছে।

"মন্দুরায় হ্রেষে অশ্ব ঊর্দ্ধ কর্ণে শুনি
নূপুরের ঝনঝনি, কিঙ্কিণীর বোলি,"—(৩য় সর্গ)

ইহা অশ্ব-প্রকৃতির স্বাভাবিক বর্ণনা।

"পাগলিনী-প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে
পদযুগ, সুবদনে!—জাগিনু অমনি।"—(৪র্থ সর্গ)

স্বপ্নে দৌড়াইতে গেলে স্বপ্ন-ভঙ্গ হয়। সুতরাং, এখানে স্বভাবের যথাযথ বর্ণনা করাই হইয়াছে।

প্রথম সর্গে রণক্ষেত্র-বর্ণনা, চতুর্থ সর্গে সীতা-কথিত পঞ্চবটী-বাস বর্ণনায় অনেকস্থলই স্বভাবোক্তির সুন্দর উদাহরণ।

সমাসোক্তি—সমান কার্য্য, সমান লিঙ্গ ও সমান বিশেষণ দ্বারা বর্ণনীয় অচেতন পদার্থে সচেতনের কার্য্যাদির সম্যক্ আরোপ। যথা—

"—নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু, মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি;
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি,
তোমার! উঠ, গো, শোক পরিহরি, সতি!"—(১ম সর্গ)

এখানে, অচেতন রাক্ষসপুরীতে সচেতন-ও-শোকাকুলা রাজ-সুন্দরীর কার্য্যাদি আরোপিত হইয়াছে। অন্যত্র—

"নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি"—(৩য় সর্গ)
"—ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে-দুয়ারে"———(৪র্থ সর্গ)

আধুনিক এক টীকাকার, যেমন টীকায়, তেমনি অলঙ্কার-বিচারে, স্থানে-স্থানে বড়ই শোচনীয় ভ্রমে পতিত হইযাছেন। ইন্দ্রের সভায়—

"————ছয় রাগ, মূর্ত্তিমতী
ছত্রিশ রাগিণী সহ আসি আরম্ভিলা
সঙ্গীত।"——————————(২য় সর্গ)

এখানে, ঐ টীকাকার মহাশয় "সমাসোক্তি অলঙ্কার" বলিয়াছেন। ফলতঃ এখানে কোন অলঙ্কারই নয়। রাগ-রাগিণীরা নিজ-নিজ মূর্ত্তিতে দেবেন্দ্রের সভায় আসিয়া গীত আরম্ভ করিলেন। 'মূর্ত্তি' এখানে কল্পিত বা আরোপিত নহে।

অন্যত্র যথা—যমপুরী-বর্ণনায়—

"অস্থিচর্ম্মসার, দ্বারে দেখিলা সুরথী,
জ্বর-রোগ।"————————(৮ম সর্গ)

এখানেও ঐ টীকাকার "সমাসোক্তি অলঙ্কার" বুঝিয়াছেন। কিন্তু এখানেও কোন অলঙ্কার নহে। জ্বরাদি রোগ-সকল এবং হত্যাদি উপদ্রব সকল মূর্ত্তিমন্ত শমন-দূত। জ্বরাদিতে মূর্ত্তি কল্পনা করা হয় নাই। সত্য-সত্যই তাহারা মূর্ত্তিমন্ত যমদূত, যম-দ্বারে বিদ্যমান। সে সব মূর্ত্তির যথাযথ বর্ণনাও কবি দিয়াছেন।

দৃষ্টান্ত—বর্ণনীয় বিষয়ের সমর্থনার্থ সমভাবাপন্ন বিষয়ের দৃষ্টান্ত দিলে দৃষ্টান্তালঙ্কার হয়। ইহাতে 'যথাদি' উপমা-সূচক চিহ্ন থাকে না এবং উপমান ও উপমেয়ের সাধারণ ধর্ম্মও এক বলিয়া দেখান হয় না। কারণ, 'যথাদি' চিহ্ন থাকিলে উপমা এবং সাধারণ ধর্ম্ম একরূপ হইলে প্রতিবস্তূপমা হয়।

"কিন্তু জেনে-শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ। হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল-হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে"————(১ম সর্গ)

পুত্র-শোকে রাবণের মন সান্ত্বনা মানিতেছে না; একটি নৈসর্গিক দৃষ্টান্ত দিয়া তাহাই উদাহৃত হইয়াছে।

"চলহ দেবি, মোর সঙ্গে তুমি;
পরিমল-সুধাসহ বহিলে পবন,
দ্বিগুণ আদর তার! মৃণালের রুচি
বিকল-কমল-গুণে, শুন, লো ললনে।"—(২য় সর্গ)

এখানে, দুইটি নৈসর্গিক দৃষ্টান্ত দিয়া, শচীকান্ত শচীকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে বলিতেছেন।

"————মধ্যাহ্নে কি কভু
যান চলি অস্তাচলে দেব আংশুমালী,
জগত-নয়নানন্দ?"—————(৬ষ্ঠ সর্গ)

মেঘনাদের জন্য শোক করিতে-করিতে বিভীষণ এই দৃষ্টান্তটি দিয়া মেঘনাদের যৌবনাবস্থাতে কাল-কবলিত হওয়ার বিচিত্রতা দেখাইলেন।

"রাহুগ্রাসে হেরি সূর্য্যে কার না বিদরে
হৃদয়? যে তরুরাজ জ্বলে তাঁর তেজে
অরণ্যে, মলিন-মুখ সেও, হে, সে কালে।"—(৯ম সর্গ)

রাম দুইটি নৈসর্গিক দৃষ্টান্ত দিয়া রাবণের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন।

"যে বিধি, হে মহাবাহু, সৃজিলা পবনে
সিন্ধু-অরি; মৃগ-ইন্দ্রে গজ-ইন্দ্র-রিপু;
খগেন্দ্রে নাগেন্দ্র-বৈরী; তাঁর মায়াছলে
রাঘব রাবণ-অরি"————(৯ম সর্গ)

এখানে, রাম-রাবণের বৈরিতা তিনটি নৈসর্গিক দৃষ্টান্তে উদাহৃত।

ভ্রান্তিমান্—সাদৃশ্য-বশতঃ প্রস্তাবিত বিষয়কে অন্য বস্তু বলিয়া কবি-কল্পিত ভ্রম। (বাস্তবিক ভ্রম হইলে অলঙ্কার হয় না)।

"——বাহিরি বেগে শোভিল আকাশে
দেববান, সচকিতে জগৎ জাগিলা,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে
উদিলা।" ————(২য় সর্গ)

এখানে চাকচিক্যশালী দেবযানকে জগৎ রবিদেব বলিয়া ভাবিল;—ইহা কবি-কল্পিত ভ্রান্তি।

ব্যতিরেক—উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ কথন।

"কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে কৌরবে।"—(১ম সর্গ)

এখানে উপমান (মণিময় সভা) অপেক্ষা উপমেয়ের (রাবণের সভার) উৎকর্ষ কথিত হইয়াছে।

"——ভাতিছে কেশে রত্নরাশি ; মরি,
কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা
মেঘমালে ?"————————(৬ষ্ঠ সর্গ)

এখানে উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ দেখান হইয়াছে।

"মুকুতা-মণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল
উজ্জ্বলতর মুকুতা! শতদল-দলে
কি ছার শিশির-বিন্দু ইহার তুলনে ?"—(৫ম সর্গ)

এখানে উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ সূচিত। পূর্ব্বোক্ত টীকাকার এস্থলে "অতিশয়োক্তি" বলিয়াছেন। কিন্তু "ব্যতিরেক" এখানে কাব্যাংশে সুন্দর।

ব্যাজস্তুতি—স্তুতিচ্ছলে নিন্দা বা নিন্দাচ্ছলে স্তুতি ;—

"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ!"————————————(১ম সর্গ)

এখানে সমুদ্র-বক্ষে শিলাময় বাঁধকে "কি সুন্দর মালা" বলিয়া, স্তুতিচ্ছলে সমুদ্রকে নিন্দা করা হইয়াছে। বাচ্যার্থ স্তুতি ; কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থ নিন্দা।

নিদর্শনা—বর্ণিতব্য কার্য্যের সাদৃশ্য-হেতু কোন বস্তুতে অবাস্তব ধর্ম্মের বা কার্য্যের আরোপ।—

"—ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?"—(১ম সর্গ)

এখানে বীরবর বীরবাহু ও শাল্মলী তরুবরের পতনে সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য ফুল-দলে কর্ত্তন-শক্তি (এই অবাস্তব ধর্ম্ম) আরোপ করা হইয়াছে।

লক্ষণা—শব্দের বৃত্তি-বিশেষ, যাহা দ্বারা শব্দেব মুখ্যার্থের সঙ্গে অন্যার্থের বোধ হয়।

"—এ বিশ্বে ও রাঙা পা দুখানি
বিশ্বের আকাঙ্খা, মা গো!"—(২য় সর্গ)

এখানে, "বিশ্বের আকাঙ্খা" গৌণার্থে বিশ্ববাসীর আকাঙ্খা বুঝাইতেছে।

"ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে"—(৪র্থ সর্গ)

এখানে, 'লঙ্কা' লঙ্কাবাসীকে বুঝাইতেছে।

এইরূপ—

"—বাঁধ হে আজি কৃতজ্ঞতা-পাশে
রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য, দাক্ষিণ্য প্রকাশি।"—(৭ম সর্গ)

এখানে, "দাক্ষিণাত্য" অর্থে দাক্ষিণাত্য-বাসী।

প্রতীপ—উপমানকে উপমেয়-রূপে বর্ণনা অথবা উপমানের বৈকল্য বা নিষ্ফলতা প্রদর্শন। যথা—

"অধর-অমৃত-আশে ভুলিলা অমৃত
দেব-দৈত্য; নাগদল নম্র-শিরঃ লাজে,
হেরি' পৃষ্ঠদেশে বেণী, মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচযুগ।"—(২য় সর্গ)

এখানে, উপমানের—(অমৃত, নাগদল ও মন্দরের) বিকলতা দেখান হইয়াছে।

সন্দেহ—উপমেয়ে উপমান বলিয়া কল্পিত সন্দেহ।

"চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির-বাহিরে,
নিশীথে কি ঊষা আসি' উতরিলা হেথা?"—(৩য় সর্গ)

এখানে, প্রমীলা দূতীকে ঊষা বলিয়া কল্পিত সন্দেহ। প্রকৃত সন্দেহ স্থলে অলঙ্কার হয় না।—

"—প্রাণদান পাইল কি পুনঃ
কপট-সমরী মূঢ় সৌমিত্রি? কে জানে—
অনুকূল দেবকুল তাই বা করিল।"—(৭ম সর্গ)

এখানে, রাবণের প্রকৃত সন্দেহই হইতেছে। সুতরাং এখানে কোন অলঙ্কার

নহে। পূর্ব্বোক্ত টীকাকার এখানে "সন্দেহালঙ্কার" কহিয়াছেন। কল্পিত সন্দেহ না হইলে "সন্দেহালঙ্কার" হয় না।

দীপক—একই কর্ত্তৃপদেব অনেকগুলি ক্রিয়া থাকিলে দীপক হয়; যথা—

"অজিন, রঞ্জিত, আহা কত শত রঙে,
পাতি' বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিনী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত, শুনি' কোকিলের ধ্বনি,
কভু বা প্রভুর সনে ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে, দেখিতাম তরল সলিলে"———(৪র্থ সর্গ)

এখানে, উহ্য "আমি" কর্ত্তৃপদের সহিত ক্রমান্বয়ে "বসিতাম," "নাচিতাম," "গাইতাম," "ভ্রমিতাম," "দেখিতাম," এতগুলি ক্রিয়াব সম্বন্ধ রহিয়াছে।

তুল্যযোগিতা—একই ক্রিয়ার সহিত নানা বিষয়ের সম্বন্ধ প্রদর্শন; যথা—

"শুনেছি, রাক্ষস-পতি, মেঘের গর্জ্জনে,
সিংহ-নাদে, জলধির কল্লোলে";———(১ম সর্গ)

অন্যত্র—

"———চমকিলা দিবে
অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে?"———(৩য় সর্গ)

অপ্রস্তুত প্রশংসা—অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনা দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ের প্রশংসা বা প্রতীতি করণ।—

"কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবি-কর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজ গুণে আলো করে বনে

সে কিরণ ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে।"———(৪র্থ সর্গ)

অপহ্নুতি—উপমেয়ের বা প্রকৃত বস্তুর অপলাপ করিয়া উপমানের বা অপ্রকৃত বস্তুর স্থাপন ; যথা—

"বৃষ্টিচ্ছলে গগন কাঁদিলা"———(৬ষ্ঠ সর্গ)

এখানে, বৃষ্টির অপহ্নব করিয়া, তাহাতে ক্রন্দনেব আরোপ করা হইয়াছে।

অর্থান্তরন্যাস—অন্য বিষয়েব উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের সমর্থন ; যথা—

"কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার বুঝিতে না পারি!"—(৪র্থ সর্গ)

স্মরণ—প্রস্তাবিত বিষয়েব অনুভূতি হইতে সদৃশ বিষয়েব স্মরণ ; যথা—

"সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতি-সুত যত
বিবাদিল দেব সহ সুধামধু-হেতু।
মোহিনী-মুরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।" –(২য় সর্গ)

বিষম—কার্য্য-কারণে বৈষম্য ; যথা—

"—হেরিলে ফণী পলায় তরাসে,
যার দৃষ্টি-পথে পড়ে কৃতান্তের দূত .
হায় রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে
বাঁধিতে গলায় ?"—————(৫ম সর্গ)

কোথায় সাপ দেখিয়া পলায়ন, আব কোথায় তাহাকে গলায় বাঁধা !

নিশ্চয়—অপ্রকৃত উপমান পরিহার করিয়া প্রকৃত বিষয়ের স্থাপন ; যথা।—

"———কাঁপিছে এ পুরী
রক্ষোবীর-পদ-ভরে, নহে ভূকম্পনে।"—(৭ম সর্গ)

এখানে, ইতিপূর্ব্বোক্ত উপমান "ভূকম্পন" পরিহার করিয়া প্রকৃত বিষয় অর্থাৎ "রক্ষোবীর-পদ-ভরে" লঙ্কাপুরীর কম্পন নিশ্চয়ীকৃত হইয়াছে।

পরিণাম—কবি-কল্পনায় এক বস্তুর অন্য বস্তুতে পরিণতি ; যথা—

"—এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি
চন্দ্র-সূর্য্য-তারা-রূপে দীপে অহরহঃ
উজ্জ্বলে।—"————————(৮ম সর্গ)

এখানে, বিধাতার হাসি চন্দ্র-সূর্য্য ও তারা-রূপে পরিণত হইয়াছে।

বিভাবনা—প্রসিদ্ধ কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তি ; যথা—

"মরে নর কাল-ফণী-নখর-দংশনে ;—
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণী,
মণিময়, হেরি' তারে কাম-বিষে জ্বলে
পরাণ।"————————(৫ম সর্গ)

এখানে, প্রসিদ্ধ কারণ (দংশন) ব্যতিরেকে, শুধু হেরিয়াই প্রাণ-জ্বালা !

সূক্ষ্ম—সঙ্কেত দ্বারা কোন বিষয়ের সূক্ষ্ম অর্থের প্রতি ইঙ্গিত ; যথা—

"————দেখিলা বিস্ময়ে
রঘুরাজ, অহি-সহ যুঝিছে অম্বরে
শিখী।

* * *

গত-প্রাণ শিখিবর পড়িলা ভূতলে ;
গরজিলা অজগর, বিজয়ী সংগ্রামে।"—(ষষ্ঠ সর্গ)

এখানে, সর্প ও ময়ূরের যুদ্ধ ও তাহাতে ময়ূরের বিনাশ, এই মায়া-দৃশ্যে ভবিতব্য মেঘনাদের পতনের ইঙ্গিত কল্পিত হইয়াছে।

আরও নানাবিধ অলঙ্কার এই কাব্যে দৃষ্ট হয়। বাহুল্য-ভয়ে সে সকলের উল্লেখ করা গেল না। যাহা হউক, ইহা হইতেই পাঠকের উপলব্ধি হইবে, মেঘনাদ-বধ-

কাব্যখানি কাব্যালঙ্কারে কি সুন্দর-রূপেই সমলঙ্কৃত ! কবি বিনয় করিয়া বলিয়াছেন বটে,—

"————ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা ; কিন্তু কোথা পা'ব
(দীন আমি !) রত্নরাজী ?"———(৪র্থ সর্গ)

কিন্তু মাতৃ-ভাষাকে তিনি কিরূপ বিবিধ রত্নালঙ্কারে সাজাইয়াছেন, এই কাব্য চিরকাল তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

রস

"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্" ;—সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহাই কাব্যের সূত্র। ইহার অর্থ এই যে, রস যাহার আত্মা, এমন বাক্যই কাব্য। শব্দ ও অর্থ যে কাব্য-পুরুষের শরীর, উপমাদি যাহার অলঙ্কার, মাধুর্য্যাদি যাহার গুণ, ধ্বনি যাহার জীবন, রস সেই কাব্য-পুরুষের আত্মা অর্থাৎ মূলীভূত সার-স্বরূপ। * ছন্দ, অলঙ্কার, গুণাদি ঐ কাব্য-দেহাত্মাবই উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত। রস্-ধাতুর অর্থ আস্বাদন-করা। কাব্যে যাহা আস্বাদনীয়, তাহাই কাব্য-রস। কাব্য পড়িলে বা শুনিলে বিশেষ-বিশেষ স্থলে বিশেষ বিশেষ ভাব মনোমধ্যে উদিত হয়। ভাব স্থায়ী হইলেই রসের উৎপত্তি। "স্থায়িভাবো রসঃস্মৃতঃ"। উপভোগ্য বলিয়া ইহাই কাব্যের আস্বাদনীয় বস্তু। ইহা বাক্যে বুঝাইবার বস্তু নহে ;—ইহা অনির্ব্বচনীয়। এই জন্য অলঙ্কার-শাস্ত্রকার ভরত ইহাকে "ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ" বলিয়াছেন অর্থাৎ কাব্য-রস ব্রহ্মাস্বাদেরই মত। ব্রহ্মও "রসো বৈ সঃ"—অনির্ব্বচনীয়, কেবল মাত্র অনুভূতি-গ্রাহ্য। কাব্য-রসও সেইরূপ—সহৃদয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুভব দ্বারা আস্বাদনীয়। অনুরাগ-উৎসাহাদি মানব-

---

Emotion অর্থাৎ রসই যে সৌন্দর্য্যের মূলীভূত সার-বস্তু, একথা পাশ্চাত্য দেশে এখন স্বীকৃত হইতেছে—"In the history of aesthetics we may discover a growing concensus of emphasis upon the doctrine that all beauty is the expression of what may be generally called emotion, and that all such expression is beautiful"—(Caritt's Theory of Beauty, 1914).*

মনের নানাবিধ চমৎকার ভাব অবলম্বনে নানাবিধ রসের সৃষ্টি। ভাব-ভেদে স্বাদ-ভেদ অর্থাৎ রস-ভেদ! আলাঙ্কারিকেরা নয় প্রকার, কেহ-বা দশ প্রকার কাব্য-রসের উল্লেখ করেন ;—

"শৃঙ্গার বীর করুণাদ্ভুত হাস্য ভয়ানকাঃ।
বীভৎস রৌদ্রো বাৎসল্যং শান্তশ্চেতি রসাঃ দশ॥"

শৃঙ্গার (বা আদ্য), বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র বাৎসল্য ও শান্ত।

যে-ভাব স্থায়ী হইলে যে-রসের উৎপত্তি, সেই ভাবকে সেই রসের স্থায়িভাব বলে। যেমন অনুরাগ শৃঙ্গারের, উৎসাহ বীরের ইত্যাদি। যাহা স্থায়িভাবের উদ্বোধক অর্থাৎ প্রকাশক, তাহার নাম "বিভাব"। বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন-বিভাব ও উদ্দীপন-বিভাব। যাহাকে অবলম্বন করিয়া স্থায়িভাবের উদ্রেক হয়, তাহাকে সেই রসের আলম্বন-বিভাব বলে ;—যেমন, শত্রু-অবলম্বনে ক্রোধের সৃষ্টি হয় বলিয়া, শত্রু রৌদ্র-রসের আলম্বন-বিভাব। আলম্বনের চেষ্টা-ক্রিয়াদি, যাহা দ্বারা রসের স্থায়িভাব উদ্দীপিত হয়, তাহাই উদ্দীপন-বিভাব ;—যেমন, রৌদ্র-রসে শত্রুর চেষ্টাদি। এক কথায়, যাহা রসের প্রধান বিষয়, তাহাই আলম্বন-বিভাব; আর যাহা রসের পরিপোষক, তাহাই উদ্দীপন-বিভাব। স্থায়িভাবের বাহ্যক্রিয়াকে সেই রসের অনুভাব বলে ;—যেমন, ক্রন্দনাদি করুণ-রসের অনুভাব। এই গুলিকে রসের উপকরণ (structural elements) বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ছন্দ, ভাষা, অলঙ্কার, গুণাদি যাহা এই ভূমিকায় আলোচনা করা হইতেছে, সে-সকলই কবিতার structural elements—অর্থাৎ রসোৎপাদনের উপকরণ-মাত্র। এই সকল উপকরণের সুসমাবেশের উপরেই রসের উৎকর্ষ নির্ভর করে। রস অনির্ব্বচনীয় হইলেও উহার উপকরণগুলি সেরূপ নয়; উহারা বোধগম্য—বুঝাও যায়, বুঝানও যায়।

যখন ভাব স্থায়ী হইলে রসের উৎপত্তি, তখন লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, রচনায় যেন কোন বিরোধী ভাব ভাবান্তর ঘটাইয়া রসোভঙ্গ না করে। কেহ শোক

করিতে-করিতে যদি তাহার মধ্যে কৌতুক করিয়া ফেলে (যাহাতে হাস্যের উদ্রেক হয়), তাহা হইলে শোক-ভাব স্থায়ী হইতে পাইল না,—বিরোধী ভাব কৌতুক আসিয়া, অর্থাৎ করুণ-রসে হাস্য-রস আনিয়া রসোভঙ্গ ঘটাইল। ইহা কাহারই ভাল লাগে না। সঙ্গীতে যেমন পৃথক্-পৃথক্ রাগ-রাগিণীর পৃথক্-পৃথক্ বিবাদী স্বর আছে, আলাপ-কালে যাহা ধ্বনিত হইলে সেই রাগ বা রাগিণী স্বর-ভ্রষ্ট হইয়া অনুপভোগ্য হয়, কাব্য-রসেও সেইরূপ। কোন রসের পরিপুষ্টিকালে, যদি বিরোধী রস আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে রসোভঙ্গ হয়। রসোভঙ্গ হইলে রচনার স্বাদ নষ্ট হয়। সেরূপ রচনা সুধীগণের অনুপভোগ্য। পায়সের সঙ্গে নিম-ঝোল কাহার রুচিকর?—অথবা তিক্ত মুখেই বা কে মিষ্টান্ন উপভোগ করে?

মেঘনাদবধ-কাব্যে সকল রসই আছে। তবে তাহার মধ্যে বীর ও করুণ রসেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এ দুয়ের মধ্যে আবার বীর-রসেরই প্রাধান্য এ কাব্যে বেশী। সেইজন্য আমি প্রথমে বীর এবং তৎপরে করুণ রসের বিষয় কহিয়া, পরে অন্যান্য রসের কথা কহিব।

বীর—দান, ধর্ম্ম, দয়া ও যুদ্ধ-বিগ্রহ উপলক্ষে উৎসাহ হইতেই বীর রসের উৎপত্তি। ইহা পাঠকের বা শ্রোতাব মনে বীব-ভাব উদ্দীপিত করে। সুতরাং, ইহা একটী পরম উপভোগ্য বস। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে ইহা উত্তম-প্রকৃতি ও হেম-বর্ণ বলিয়া বর্ণিত। মহেন্দ্র এই রসের অধিদেবতা। বিজেতব্য ইহার আলম্বন-বিভাব এবং বিজেতব্যের চেষ্টাদি উদ্দীপন-বিভাব। ভয় ও নির্ব্বেদ, উৎসাহেব বিরোধী বলিয়া, ভয়ানক ও শান্ত-রস বীর-রসের বিরোধী।

এই কাব্যখানি মুখ্যতঃ যুদ্ধ-সম্বন্ধীয় বীর-রসাত্মক। ইহাতে নানা স্থলে করুণ-রসের অতি সুন্দর অভিব্যক্তি থাকিলেও, বিশেষতঃ ইহার শেষ-সর্গে করুণ-রস যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া পাঠককে অভিভূত করিয়া ফেলিলেও, বলিতে হইবে যে, বীর-রসই এই কাব্যের প্রধান রস। ইহা হইবারই কথা। রামায়ণের লঙ্কা-যুদ্ধ এবং তাহার উদ্যোগায়োজন যে কাব্যের বিষয়; রাবণ, মেঘনাদ, লক্ষ্মণ, যে কাব্যে যুযুধান বীর-পুরুষ; এমন কি, যুবরাজ-মহিষী প্রমীলা ও তাঁহার চেড়ীগণ যে

কাব্যে বীর-রমণী-রূপে বর্ণিত; সে কাব্যে বীর-রসের প্রাধান্য হইবারই কথা; তাই কবি স্বয়ং গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন,—

"—গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত,"—(১ম সর্গ)

কবি বাঙ্গালা-কাব্যে ছন্দাংশে যেমন এক সুন্দর নূতনত্ব দিয়া গিয়াছেন, তেমনই সেই নূতন ছন্দে বীর-রসের যে কেমন চমৎকার অভিব্যক্তি হইতে পারে, তাহারও আদর্শ দিতেও বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। বাঙ্গালা-কাব্যে অমিত্রাক্ষর-ছন্দের প্রবর্ত্তনে মধুসূদনের যেমন অতুলনীয় কীর্ত্তি, ঐ ছন্দে বীর-রসের চমৎকার অভিব্যক্তিতেও তাঁহার তেমনই অসাধারণ কৃতিত্ব।

গ্রন্থারম্ভেই ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর বীরত্ব-কাহিনী শুনিয়া শোকার্ত্ত রাবণের হৃদয় বীরোচিত উৎসাহে পূর্ণ হইল;—

"———সাবাসি, দূত, তোর কথা শুনি
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে?"———————(১ম সর্গ)

পরে—

"এতদিনে" (কহিলা ভূপতি)
"বীর-শূন্য লঙ্কা মম! কে আর রাখিবে
রাক্ষস-কুলের মান? যাইব আপনি।
সাজ, হে বীরেন্দ্র-বৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ!
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি!
অরাবণ, অরাম বা হবে ভবে আজি!
* * *
* * সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গম্ভীর জীমূত-মন্দ্রে! সে ভৈরব রবে
সাজিল কর্ব্বুর-বৃন্দ বীরমদে মাতি,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস!" ইত্যাদি———(১ম সর্গ)

এইরূপ উৎসাহ-ব্যঞ্জক উক্তিতে এবং উদ্যোগে বীর-রস উপভোগ্য।

রাবণ মেঘনাদকে বারংবার যুদ্ধে পাঠাইতে অনিচ্ছুক হইলে, মেঘনাদের উৎসাহ-ব্যঞ্জক উক্তি বীর-রসাত্মক ;—

"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি ;
রাজেন্দ্র ! থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে" ।—(১ম সর্গ)

তৃতীয় সর্গে প্রমীলা এবং তাঁহার চেড়ীগণের লঙ্কা-প্রবেশার্থ বীর-সজ্জার বর্ণনা—

"উথলিল চারিদিকে দুন্দুভির ধ্বনি ;
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,
উলঙ্গিয়া অসিরাশি কার্ম্মুক টঙ্কারি,
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে !"————(৩য় সর্গ)

ইত্যাদি চমৎকার বীর-রসাত্মক। এইরূপ উৎসাহ-ব্যঞ্জক যুদ্ধোদযোগ-বর্ণনা এ কাব্যে বহুস্থলে বিদ্যমান্। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সর্গের অনেক স্থলেই বর্ণনায় ও কাব্যে বীর-রস উচ্ছলিত।

করুণ—ইষ্টনাশে বা অনিষ্ট-পাতে বা প্রিয়-বিয়োগে যে শোক, তাহা হইতেই এই রসের উৎপত্তি। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহা কপোত-বর্ণ ও যম-দৈবত বলিয়া বর্ণিত। শোক ইহার স্থায়িভাব ; শোচ্য ব্যক্তি বা বিষয় ইহার আলম্বন বিভাব ; তদ্বিষয় দর্শন, শ্রবণ, মননাদি ইহার উদ্দীপন-বিভাব এবং ক্রন্দনাদি ইহার অনুভাব। আদ্য ও হাস্য ইহার বিরোধী ; কারণ, অনুরাগ ও হাস্য, শোকের বিপরীত।

এ কাব্যে বীর-রসের পরেই করুণ-রসের প্রাধান্য এবং কবির অসামান্য তুলিকা-গুণে এ কাব্যে করুণ-রসের অভিব্যক্তি বঙ্গ-সাহিত্যে অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে। কাব্যারম্ভেই মূর্ত্তিমান করুণ-রস ;—

"এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুল-পতি,
বাক্য-হীন পুত্র-শোকে। ঝর-ঝর-ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা, তিতিয়া বসনে"—(১ম সর্গ)

তারপর, বীরবাহুর মৃত্যুতে শোকে রাবণের বিলাপ—"নিশার স্বপন সম, তোর এ বারতা" ইত্যাদি ; লঙ্কার রণক্ষেত্র বর্ণন ; সভাস্থলে বীরবাহু-জননী চিত্রাঙ্গদার বিলাপ ; চতুর্থ সর্গে সীতা ও সরমার কথোপকথন ; অষ্টম সর্গে মৃতপ্রায় লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে করিয়া রামের ক্রন্দন এবং সর্ব্বশেষে নবম সর্গে মৃত মেঘনাদের সামরিক অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার বর্ণনা ও প্রমীলার সহমরণ—এই সকল স্থলের করুণ-রস—কেবল বাঙ্গালা-সাহিত্যে কেন ;—যে-কোন সাহিত্যেই গৌরবের বিষয় হইতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

চিতারোহণ-কালে প্রমীলার মুখে

> "—লো সহচরি, এতদিনে আজি
> ফুরাইল জীব-লীলা জীব লীলা-স্থলে"—(৯ম সর্গ)

এবং তৎপরে মেঘনাদ ও প্রমীলার চিতা-সমক্ষে "বিশদ-বস্ত্র" ও "বিশদ-উত্তরী" রাবণের মুখে—

> "ছিল আশা মেঘনাদ, মুদিব অন্তিম
> এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে ,"—(৯ম সর্গ)

করুণরসের উৎস বলিলেও হয়। বোধ হয়, যেন রাবণের বজ্র-হৃদয় ফাটিয়া শোণিতের উষ্ণধারা ঝলকে-ঝলকে নির্গত হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে—

> "করি স্নান সিন্ধুনীরে রক্ষোদল এবে
> ফিরিলা লঙ্কার পানে আর্দ্র অশ্রুনীরে—
> বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী-দিবসে !
> সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।"—(৯ম সর্গ)

ইহাতে পাঠককে সপ্ত দিবানিশির অপেক্ষাও বেশী দিন করুণ-রস-সিক্ত হইয়া থাকিতে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। করুণ-রসে কবির যে এতখানি ক্ষমতা ছিল, তাহা কবি নিজেও জানিতেন না। লিখিতে-লিখিতে, বোধ হয়, নিজেই অশ্রু-সিক্ত

হইয়া তাহা অনুভব করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার এক বন্ধুকে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"I can tell you that you have to shed many a tear for the glorious Rakhasas, for poor Lakhana, for Promila. I never thought, I was such a fellow for the pathetic."

রৌদ্র—ক্রোধ হইতে রৌদ্র-রসের উৎপত্তি। সেইজন্য সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহা রক্তবর্ণ ও রুদ্রাধিষ্ঠিত বলিয়া বর্ণিত। ক্রোধ ইহার স্থায়িভাব, শত্রু আলম্বন-বিভাব, এবং শত্রুর চেষ্টাদি উদ্দীপন-বিভাব। আদ্য, ভয়ানক ও হাস্য এই রসের বিরোধী। কারণ, ক্রোধাবস্থায় মনে অনুরাগ, ভয়, বা হাস্যের উদ্রেক একেবারেই অসম্ভব এবং তাহা হইলে, স্থায়িভাব ক্রোধের পরিস্ফুটনে ব্যাঘাত হয়, ইহা বলাই বাহুল্য।

বীর-রসের স্থায়িভাব উৎসাহ। ইহাই মনে রাখিয়া, রৌদ্র ও বীরের পার্থক্য বুঝিতে হইবে। যুদ্ধ-বিগ্রহ-ঘটিত কাব্যে রৌদ্র-রস থাকিবারই কথা। এ কাব্যেও রৌদ্ররস বড় অপ্রচুর নহে।

বাসন্তী প্রমীলাকে লঙ্কায় যাইতে বারণ করিলে, প্রমীলা "রুষিয়া" কহিলেন—

"কি কহিলি, বাসন্তি ? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে, সে রোধে তার গতি ?"—(৩য় সর্গ)

ইহা রৌদ্র-রসের সুন্দর উদাহরণ-স্থল। রমণীর মুখে রৌদ্র-রসের সমধিক চমৎকারিত্ব !

ষষ্ঠ সর্গে নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ ও মেঘনাদের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত রসের অপূর্ব্ব সমাবেশ আছে। সেখানে পাঠক স্থায়িভাব বিচার করিয়া রস-নির্ণয় করিবেন। দুই-এক স্থল উদ্ধৃত করিতেছি।

মেঘনাদ লক্ষ্মণকে ছদ্মবেশী অগ্নিদেব বলিয়া ভ্রম করিলে,—

"উত্তরিলা বীর-দর্পে রৌদ্র দাশরথি ;—
"নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া,
রাবণি। লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে।
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম ; দেহ রণ মোরে
অবিলম্বে।"————–(৬ষ্ঠ সর্গ)

এখানে রৌদ্র-রস মূর্ত্তিমান্। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়, কবি বিশেষ-বিশেষ স্থলে রসের জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করিয়া নিজেই তত্তৎস্থলেব রসের পরিচয় দিয়াছেন— "বিস্ময়" শব্দের প্রয়োগে অদ্ভুত-রসের পরিচয় ; ভয়-ব্যঞ্জক "কাঁপিলা" আদি শব্দে ভয়ানক-রসের পরিচয়, "সরোষে", "রুষিয়া," ইত্যাদি শব্দে রৌদ্র-রসের পরিচয়। উপরে উদ্ধৃত অংশে "রৌদ্র দাশরথি" রৌদ্র-রসের পরিচায়ক।

সপ্তম সর্গে রাক্ষস-সৈন্যদিগের প্রতি মেঘনাদ-বধের প্রতিশোধে উদ্যোগী রাবণের "ক্রোধভরে" অভিভাষণ—

"দেব-দৈত্য-নর রণে যার পরাক্রমে
জয়ী রক্ষঃ-অনীকিনী"—(৭ম সর্গ)

যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ্মণের প্রতি রাবণের উক্তি রোষ-ব্যঞ্জক ; সুতরাং রৌদ্র-রসাত্মক—

"এতক্ষণে, রে লক্ষ্মণ",—কহিলা সরোষে
রাবণ,—"এ রণ ক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে,
নরাধম ? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি ?"—(৭ম সর্গ)

মেঘনাদের মৃত্যুতে মহাদেবের রুদ্র-মূর্ত্তির বর্ণনা রৌদ্ররসের উৎকৃষ্ট উদাহরণ ;—

"অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে !
লড়িল মস্তকে জটা ; ভীষণ গর্জ্জনে
গর্জ্জিল ভুজঙ্গবৃন্দ ; ধক্-ধক্-ধকে
জ্বলিল অনল ভালে ; ভৈরব কল্লোলে
কল্লোলিলা ত্রিপথগা,"—(৯ম সর্গ)

অদ্ভুত—আশ্চর্য্য-জনক বিষয়ে বা দৃশ্যে যে বিস্ময়-ভাবের উদয় হয়, তাহা হইতে অদ্ভুত রসের উৎপত্তি। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহা পীত-বর্ণ ও গন্ধর্ব্বাধিষ্ঠিত বলিয়া বর্ণিত। বিস্ময় ইহার স্থায়িভাব। অলৌকিক বিষয় বা ব্যাপার ইহার আলম্বন-বিভাব, এবং তাহার মহিমাদি, উদ্দীপন বিভাব। অন্য কোন রস ইহার বিরোধী নহে।

যুদ্ধাদি ব্যাপার লইয়া যে-কাব্য, প্রেতপুরীর সুবিস্তৃত বর্ণনা যে-কাব্যে আছে, সে-কাব্যে অদ্ভুত-রস থাকিবারই কথা। কোন-কোন স্থলে বীর ও ভয়ানকের সঙ্গে, অদ্ভুতেরও সমাবেশ আছে। পাঠকগণ স্থায়িভাব স্মরণ করিয়া রস-নির্ণয় করিবেন। উৎসাহ ও ক্রোধে যেমন বীর ও রৌদ্রের পার্থক্য, তেমনই বিস্ময় ও ভয়ে, অদ্ভুত ও ভয়ানকের পার্থক্য বুঝিতে হইবে।

প্রথম সর্গারম্ভে ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর যুদ্ধকাহিনী-বর্ণনায়—

"ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগনে; বিদ্যুৎ-ঝলা-সম চক্‌মকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর-প্রদেশে
শন্‌শনে।"————————(১ম সর্গ)

ইহা অদ্ভুত-রসের উদাহরণ। বিস্ময়ই এ বর্ণনার স্থায়িভাব।

তৃতীয় সর্গে বীরবেশধারিণী প্রমীলাকে দেখিয়া হনুমানের বিস্ময়-ভাবাত্মক-উক্তি—

"অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, উতরিনু বলে"—(৩য় সর্গ)

এবং নৃমুণ্ডমালিনীকে বিদায় দিয়া বিভীষণের কাছে রামের উক্তি—

"ভৈরবরূপিণী বামা"—কহিলা নৃমণি,
"দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া,"—(৩য় সর্গ)

এ-সব অদ্ভুত-রসাত্মক। কোন-কোন সমালোচক এখানে রামের উক্তি ভয়-ব্যঞ্জক ভাবিয়া কবিকে দোষ দেন। বস্তুতঃ তাঁহারাই ভ্রান্ত। বীর নারী দেখিয়া রামের ঐ-সব উক্তি বিস্ময়-ব্যঞ্জক; কারণ, বেশে ও সাহসে এমন বীর-নারী রামের পক্ষে অদৃষ্ট-পূর্ব্বা।

পঞ্চম সর্গে যখন লক্ষ্মণ চণ্ডী-পূজার্থ দুর্গম বন-পথে যাইতেছেন, তখন—

"কতক্ষণে উত্তরিয়া উদ্যান-দুয়ারে
ভীমবাহু, সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন, মূর্ত্তি। দীপিছে ললাটে
শশিকলা" ইত্যাদি।———(৫ম সর্গ)

এখানে ভয়ানক-রস নহে;—অদ্ভুত-বস। কাবণ, মূর্ত্তি "ভীষণ-দর্শন", হইলেও লক্ষ্মণের মনে ভয়ের উদয় হয় নাই;—তিনি "সবিস্ময়ে"ই তাহা দেখিতেছেন। ভয় হইলে, তৎপরে বীব-কেশরী "নিষ্কোষিয়া তেজস্কব অসি" বিরূপাক্ষকে বণে আহ্বান করিতে পারিতেন না। এখানেও কবি "সবিস্ময়" দ্বারা বসেব ইঙ্গিত করিয়াছেন।

অষ্টম সর্গে প্রেত-পুবীর বর্ণনায় নানাস্থানে অদ্ভুত-রসের সমাবেশ আছে। সে সমস্ত উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। যেথানে বিস্ময় স্থায়িভাব, সেইখানেই অদ্ভুত-বস; ইহা মনে রাখিলেই "অদ্ভুত"কে "ভয়ানক" বলিয়া ভ্রম হইবাব সম্ভাবনা থাকিবে না। প্রেত-পুরীর বর্ণনারম্ভেই—

"সবিস্ময়ে রঘুনাথ নদীর উপরে
হেরিলা অদ্ভুত সেতু; অগ্নিময় কভু,
কভু ঘন ধূমাবৃত, সুন্দর কভু বা,
সুবর্ণে নির্ম্মিত যেন! ধাইছে সতত
সে সেতুর পানে, প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটী
হাহাকার-নাদে কেহ, কেহ বা উল্লাসে!"—(৮ম সর্গ)

এখানে দৃশ্যটী বিস্ময়-জনক; সুতরাং অদ্ভুত-রসাত্মক। বর্ণনারম্ভে "সবিস্ময়ে" রসের ইঙ্গিত।

ভয়ানক—ভয় হইতে ইহার উৎপত্তি। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহা কৃষ্ণবর্ণ, কালাধিষ্ঠিত ও স্ত্রীবৎ ভীরু-প্রকৃতি বলিয়া বর্ণিত। ইহা বীর-রসের ঠিক বিপরীত। বীর-রস অর্থাৎ দান, ধর্ম্ম, দয়া ও যুদ্ধবিষয়ে পুরুষোচিত উৎসাহে যে রস, তাহা উত্তম প্রকৃতি, হেমবর্ণ এবং মহেন্দ্রাধিষ্ঠিত বলিয়া কীর্ত্তিত। আর ভয়ানক-রস অর্থাৎ ভয়াশ্রিত যে রস, তাহা নীচ-প্রকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ এবং কালাধিষ্ঠিত। উত্তম বা বীরপুরুষে, আর অধম বা কাপুরুষে যে প্রভেদ, বীর ও ভয়ানকের রূপ-কল্পনায় তাহা পূর্ণ প্রকটিত। যাহা হইতে ভয় জন্মে, তাহাই, ইহার আলম্বন-বিভাব এবং তাহার ঘোরতর ভয়-জনক চেষ্টাদি ইহার উদ্দীপন-বিভাব। আদ্য, বীর, রৌদ্র, হাস্য ও শান্ত ইহার বিরোধী। যে ব্যক্তি ভয়ে বিবর্ণ, স্খলিত-বচন, গলদ্ঘর্ম্ম, রোমাঞ্চিত ও কম্পিত-কলেবর এবং নিজেকে কালাধিষ্ঠিত ভাবিয়া "ত্রাহি মধুসূদন" ডাক ছাড়িতে থাকে, তাহার মনে তখন অনুরাগ, উৎসাহ, ক্রোধ, হাস্য বা নির্ব্বেদের স্থান কোথায়?

ভগ্নদূতের মুখে "বীরবাহুর বীরতা" বর্ণনা-কালে—

> "——এখনও কাঁপে হিয়া মম
> থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব-হুঙ্কারে।" (১ম সর্গ)

নিশাকালে বীর-রমণীদিগের লঙ্কাপ্রবেশ-কালে তাহাদের শঙ্খ-ধ্বনি ও ধনুষ্টঙ্কার শুনিয়া—

> "—কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে কাঁপিল
> মাতঙ্গে নিষাদী, রথে রথী," (৩য় সর্গ)

এ সকল ভয়ানকের উদাহরণ। অষ্টম সর্গে প্রেতপুরী বর্ণনার স্থানে-স্থানেও এই রসের অবতারণা আছে।

বীভৎস—কুৎসিতের প্রতি ঘৃণা হইতে বীভৎস-রসের উৎপত্তি। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহা নীলবর্ণ ও মহাকালাধিষ্ঠিত বলিয়া বর্ণিত। যে কুৎসিত বিষয় অবলম্বনে ঘৃণার উদ্রেক করান হয়, তাহাই ইহার আলম্বন-বিভাব এবং তাহার

বিকারাদির বর্ণনাই ইহার উদ্দীপন-বিভাব। আদ্য বা শৃঙ্গার ইহার বিরোধী। ঘৃণ্য ও নীচ-প্রকৃতি রস বলিয়া ইহার প্রচুরতা কোন কাব্যেই শোভনীয় নহে। এ কাব্যে কেবলমাত্র প্রেত-পুরীর নরক-বর্ণনায় কোন-কোন স্থলে ইহার সংক্ষিপ্ত ও সংযত উদাহরণ পাওয়া যায়। বিশালোদর উদরপরতা—

"অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য উগরি দুর্ম্মতি
পুনঃ পুনঃ হস্তে তুলিয়া গিলিছে" (৮ম সর্গ)

ইহা বীভৎস-রসের প্রকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ উদাহরণ।

উন্মত্ততার বর্ণনায়—

"———মল, মুত্র, না বিচারি কিছু,
অন্নসহ মাখি, হায়, খায়, অনায়াসে।—"(৮ম সর্গ)

ইহা যে বীভৎস-রসের চরম উদাহবণ, তাহা বলাই বাহুল্য।

আদ্য বা শৃঙ্গার—স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে একের প্রতি অন্যের অনুরাগ হইতে এই রসের উদ্ভব। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহা শ্যামবর্ণ ও বিষ্ণুদৈবত বলিয়া কীর্ত্তিত। বৈষ্ণব-সাহিত্যে ইহারই নামান্তর "উজ্জ্বল রস"। অনুরাগ ইহার স্থায়িভাব। উত্তম-স্বভাব নায়ক-নায়িকা ইহার আলম্বন-বিভাব এবং অনুরাগোদ্দীপক বিষয় ইহার উদ্দীপন-বিভাব। বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস, ইহার বিরোধী। সুতরাং, বীর-করুণ-রৌদ্রাদি-প্রধান এই কাব্যে আদ্য-রসের অবসর অতি অল্প। কয়েক স্থলে মাত্র সবিশেষ সংযত-ভাবে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

প্রমোদ-উদ্যানে প্রমীলার কাছে মেঘনাদেব বিদায়-গ্রহণকালে উভয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তি—

"———কোথা প্রাণনাথ,
রাখি এ দাসীরে, কহ চলিলা আপনি ?" (১ম সর্গ)

এবং

"———ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে" (১ম সর্গ)

—আদ্যরসের সুন্দর ও সংযত অভিব্যক্তি।

লঙ্কায় মেঘনাদের সহিত প্রমীলার মিলন-কালে উভয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তিও ঐরূপ।

চণ্ডী-পূজার্থ গমন-কালে লঙ্কায় বনরাজী-মধ্যে লক্ষ্মণের সম্মুখে বামাদলের আবির্ভাব এবং লক্ষ্মণের প্রতি তাহাদের অনুরাগাত্মিকা উক্তি আত্মরসাত্মক। তবে মায়া-দৃশ্য বলিয়া এখানে রস না বলিয়া, "রসাভাস" বলাই উচিত।

নরক-দৃশ্যে কামাতুর প্রেত-প্রেতিনীর যে শৃঙ্গার-রসাত্মক বর্ণনা আছে তাহাকেও শৃঙ্গার-রসাভাসের উদাহরণ বলিতে হইবে। যদিও পাঠকের মনে উহা বীভৎস-রসেরই উদ্রেক করে, তবু যখন তাহাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগই বর্ণনার বিষয়, তখন তাহাকে বীভৎস না বলিয়া শৃঙ্গার-রসাভাস বলাই সঙ্গত।

হাস্য—যে কৌতুকাবহ কথায়, কার্য্যে, আকারে বা ইঙ্গিতে হাস্যের উদ্রেক করে, তাহা হইতে এই রসের উৎপত্তি। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহা শ্বেতবর্ণ ও প্রমথ-দৈবত বলিয়া বর্ণিত। নির্ম্মল হাস্য শ্বেত-বর্ণই বটে এবং শিবানুচর প্রমথগণ আকার-প্রকারে হাস্য-রসেরই মূর্ত্তি-স্বরূপ। হাস্য ইহার স্থায়িভাব। অঙ্গাদির বিকৃতি, যাহাতে হাস্যের উদ্রেক করে, তাহাই ইহার আলম্বন-বিভাব এবং তাহার চেষ্টাদি উদ্দীপন-বিভাব। করুণ ও ভয়ানক ইহার বিরোধী; কারণ, শোক হাস্যের বিপরীত এবং ভয়ে হাস্য অসম্ভব। মেঘনাদবধ-কাব্যে হাস্য-রসের উদাহরণ নিতান্তই বিরল। কারণ, এরূপ গাম্ভীর্য্যময় কাব্যে তরল রসের অবসর অতি স্বল্প।

চেড়িবৃন্দ-সহ প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ-কালে পথে হনুমান্ বাধা দিলে প্রমীলার দাসী নৃমুণ্ডমালিনী যখন হনুমান্‌কে বলিল—

"দিনু ছাড়ি, প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি!"—(৩য় সর্গ)

—তখন এই অবজ্ঞা-সূচক উক্তির ভিতরে একটু হাস্য নৃমুণ্ডমালিনীর অধর-প্রান্তে দেখা দিয়াছিল বলিয়াই, উহা পাঠকের মনে হাস্যের উদ্রেক করে। বোধ হয়, সলেজ-বানরাকৃতি হনুমানের মুখে দৃপ্ত রৌদ্র-রসের বচনাবলী শুনিয়া বীর-রমণী নৃমুণ্ডমালিনীর মনে হাস্য-রসের সঞ্চার হইয়াছিল।

সুগ্রীব যুদ্ধার্থে রাবণের সম্মুখীন হইলে—

—হাসিয়া কহিলা
লঙ্কানাথ, 'রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে,
বর্ব্বর, আইলি তুই এ কনক-পুরে ?
ভ্রাতৃবধূ তারা তোর, তারকারা রূপে ;
তারে ছাড়ি কেন হেথা রথীকুল-মাঝে
তুই রে কিষ্কিন্ধ্যানাথ ? ছাড়িনু, যা চলি
স্বদেশে ! বিধবা-দশা কেন ঘটাইবি
আবার তাহার, মূঢ় ? দেবর কে আছে
আর তার ?" ———— (৭ম সর্গ)

এই তীব্র বিদ্রূপাত্মক উক্তিটী হাস্য-রসের সুন্দর উদাহরণ-স্থল। এখানে "হাসিয়া কহিলা" বলিয়া কবি রসের ইঙ্গিত করিতে ভুলেন নাই। এই দুই স্থল ব্যতীত হাস্য-রসের অবতারণা এ কাব্যে আর নাই।

শান্ত—তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে শম অর্থাৎ শান্তি বা নির্ব্বেদ হইতে এই রসের উৎপত্তি। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রমতে ইহা উত্তম প্রকৃতি ও কুন্দেন্দুসুন্দর-কান্তি বিশিষ্ট এবং শ্রীনারায়ণ ইহার দেবতা। বিমল শান্তি কুন্দেন্দুসুন্দর-কান্তিই বটে ; এবং হৃদয়ে শ্রীনারায়ণের অধিষ্ঠান না হইলে নির্ব্বেদ আসিবে কেন ? শান্তি বা নির্ব্বেদ ইহার স্থায়িভাব। বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, আদ্য ও হাস্য ইহার বিরোধী। কারণ, হৃদয়ে নির্ব্বেদের উদয়ে উৎসাহ, ক্রোধ, ভয়, অনুরাগ ও হাস্য থাকিতে পারে না।

বীর-রৌদ্রাদি-প্রধান এই কাব্যে শান্ত-রসের উদাহরণ সবিশেষ বিরল। করুণ-রসের সংশ্রবে কয়েক স্থলে শান্ত-রসের অবতারণা আছে। বীরবাহুর শোকে রাবণের উক্তিতে—

"হায় ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনক-লঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে।
* * * *
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে ?
কার্ রে বাসনা বাস করিতে-আঁধারে ?"—(১ম সর্গ)

ইহা নির্ব্বেদ-ব্যঞ্জক।

তৎপরে মন্ত্রী সারণের উক্তি—

> "বিশেষতঃ এ ভব-মণ্ডল
> মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ সুখ যত।
> মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।"—(১ম সর্গ)

—শান্ত-রসের উদাহরণ স্থল।

সীতার মুখে পঞ্চবটী-বাস-বর্ণনায় করুণ-রসের সহিত শান্ত-রসের সুন্দর অভিব্যক্তি।

নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগার-যাত্রী লক্ষ্মণ লঙ্কার বৈভবাদি দেখিয়া রাবণের ঐশ্বর্য্যমহিমা খ্যাপন করিলে, বিভীষণের উক্তি শান্ত-রসাত্মক;—

> "যা কহিলা সত্য, শূরমণি।
> এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে?
> কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে।
> এক যায়, আর আসে, জগতের রীতি,
> সাগর তরঙ্গ যথা!"——— (৬ষ্ঠ সর্গ)

বাৎসল্য—উপরি-উক্ত নয় প্রকার রস ছাড়া, সংস্কৃতে কোন-কোন আলঙ্কারিক বাৎসল্যকেও রস বলিয়া গণ্য করিয়াছেন;—

> "স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলঞ্চ রসং বিদুঃ!
> স্থায়ী বৎসলতা স্নেহঃ পুত্রাদ্যালম্বনং মতম্॥"...(সাহিত্যদর্পণম্)

উহার টীকায় আছে—"পুত্রাদীত্যাদিনা ভ্রাত্রাদিগ্রহণম্।"

পুত্রাদির অর্থাৎ পুত্র-ভ্রাতাদির প্রতি স্নেহ হইতে এই রসের উৎপত্তি। স্নেহই ইহার স্থায়িভাব। পুত্র-ভ্রাতাদি ইহার আলম্বন-বিভাব এবং তাহাদের ক্রিয়া-গুণাদি উদ্দীপন-বিভাব। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহা পদ্মগর্ভচ্ছবি-বর্ণ বলিয়া বর্ণিত এবং লোক-মাতৃকাগণ ইহার দেবতা। পদ্মপর্ণ ভেদ করিয়া সূর্য্যালোক পড়ায় পীতাভ পদ্মগর্ভচ্ছবির বর্ণ কেমন দেখায়, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন,—

উহা বাৎসল্য রসেরই বর্ণ বটে—স্নিগ্ধ এবং গাঢ়। আর, সংসারের যাবতীয় মাঙ্গলিক কার্য্যে যাঁহাদের কাছে করযোড়ে কল্যাণ-প্রার্থনা করিতে হয়, সেই সর্ব্ব-কল্যাণদাত্রী গৌর্য্যাদি মাতৃকাগণ ভিন্ন বাৎসল্য-রসের দেবতা আর কে হইতে পারে? *

উদাহরণ—মেঘনাদের প্রতি রাবণের উক্তি—

"———— ——এ কাল সময়ে
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার।" ———— ————(১ম সর্গ)

মেঘনাদের প্রতি মন্দোদরীর উক্তি—

"কেমনে বিদায় তোরে করিরে, বাছনি!
আঁধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণ শশী
আমার।" ——— ————(৫ম সর্গ)

এবং তৎপরে—

"——যাইবি রে যদি,—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে
রক্ষুন এ কাল রণে! এই ভিক্ষা করি
তাঁর পদযুগে আমি! কি আর কহিব?
নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি
আমায় এ ঘরে তুই! (৫ম সর্গ)

এই-সব স্থল পুত্রস্নেহ-অবলম্বনে বাৎসল্য-রসের সুন্দর অভিব্যক্তি।

ভ্রাতৃ-বৎসলতা, যেখানে স্নেহ স্থায়িভাব, চমৎকার হইলে, তাহাও বাৎসল্য-রস বলিয়া গণ্য। বিশেষতঃ লক্ষ্মণের প্রতি রামের স্নেহ,—যে রাম বলিয়াছিলেন—

"দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ
তন্তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ ॥—(বাঃ রমায়ণ)

---

* গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেবতা ও কুলদেবতা।

—সেই রামের ভ্রাতৃ-স্নেহ, পুত্র-স্নেহ অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে। এ কাব্যে রামের ভ্রাতৃবৎসলতা-অবলম্বনে বাৎসল্য-রসের চমৎকার অভিব্যক্তি আছে। স্বপ্নাদিষ্ট চণ্ডী-পূজার নিমিত্ত দারুণ বিভীষিকাময় ঘোর বনে প্রবেশ করিতে উৎসাহিত লক্ষ্মণ রামের কাছে অনুমতি চাহিলে, রাম যাহা বলিয়াছেন, তাহা চমৎকার বাৎসল্য-রসাত্মক!

"———— ——কত যে সয়েছ
মোর হেতু তুমি, বৎস, সে কথা স্মরিলে,
না চাহে পরাণ মোর আর আয়াসিতে
তোমায়।" ———— (৫ম সর্গ)

—এখানে 'বৎস' সম্বোধনে বাৎসল্য রসের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

তৎপরে লক্ষ্মণ যখন চণ্ডীর আদেশ রামকে জ্ঞাপন করিয়া মেঘনাদ-বধের নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করিলে সুভ্রাতৃবৎসল রামের মুখ দিয়া কবি যে চমৎকার ভ্রাতৃ-বাৎসল্যের অভিব্যক্তি করিয়াছেন, বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাহা বাৎসল্য-রসের উৎস-স্বরূপ চির-বিরাজ করিবে;—

"————হায়রে, কেমনে—
যে কৃতান্ত-দূতে দূরে হেরি, ঊর্দ্ধশ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ু-বেগে
প্রাণ লয়ে; দেব-নর ভস্ম যার বিষে!
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প-বিবরে,
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতার উদ্ধারি! (৬ষ্ঠ সর্গ)

এবং তৎপরে,—

————"কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে?"—(৬ষ্ঠ সর্গ)

এই সব রসের, বিশেষতঃ বীর-করুণ-রৌদ্রাদি প্রধান-প্রধান রসের সংযত সমাবেশে মেঘনাদবধ-কাব্যখানি রসাংশে বড়ই উপভোগ্য। ইহাতে ছন্দের স্বাধীনতা, ভাষার রসোপযোগিতা ও বিবিধ অলঙ্কারের পারিপাট্য সর্ব্বত্রই রসের উৎকর্ষ ও

পরিপুষ্টি সাধন ত করিয়াছেই; তাহা ছাড়া, সুসংযত তুলিকাপাতে সর্ব্বত্রই রস চমৎকার গাঢ় হইয়াছে! এইজন্য এই কাব্য পড়িতে কোথাও ধৈর্য্য-চ্যুতি হয় না। ইহাতে লঙ্কার রণ-ক্ষেত্রের চিত্র কয়েকটী ছত্রে কেমন সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে! বীরবাহু ও মেঘনাদের জন্য রাবণের বিলাপ সুন্দর সংযত এবং সংযত বলিয়াই গাঢ়। ইহাতে যুদ্ধোদ্যোগ-বর্ণনাগুলি সর্ব্বত্রই নাতিদীর্ঘ।

অন্যান্য রসেও সেইরূপ;—

"অধীর হইয়া শূলী কৈলাস-আলয়ে,
নড়িল মস্তকে জটা; ভীষণ গর্জ্জনে
গর্জ্জিল ভুজঙ্গ-বৃন্দ; ধক্-ধক্-ধকে
জ্বলিল অনল ভালে! ভৈরব কল্লোলে
কল্লোলিলা ত্রিপথগা"।— (৯ম সর্গ)

এখানে, অল্প কথায় রুদ্র-মূর্ত্তির কি চমৎকার শব্দ-চিত্র! মধুসূদনেব রস-সৃষ্টিতে সর্ব্বত্রই এইরূপ সংযম লক্ষিত হয়। অবশ্য ইহা অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক। ক্ষমতা না থাকিলে সংযম আসে না, সাজেও না। সুনিপুণ চিত্রকবই স্বল্প রেখাপাতে চিত্র ফুটাইতে পারেন।

বিষয়-গুণে, কাব্যোচিত ছন্দ, ভাষা, অলঙ্কার ও রসাদি গুণে এই কাব্য খানিকে মহাকাব্যই বলিতে হয়। ইংরাজীতে এপিক্ (Epic) বলিলে যদি আমাদের ভাষায় "মহাকাব্য" বুঝায়, তাহা হইলেও ইহা মহাকাব্য; আর সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে বিচাব করিলেও ইহা মহাকাব্য। বিশ্ব-বিশ্রুত রামায়ণের লঙ্কা-যুদ্ধ যে কাব্যের আখ্যান-বস্তু; অযোধ্যার সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশোদ্ভব, অশেষ-গুণ-সম্পন্ন, বীর ভ্রাতৃদ্বয় রাম, ও লক্ষ্মণ যাহাতে এক পক্ষ এবং স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল-বিজয়ী প্রবল-পরাক্রান্ত রক্ষোরাজ রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ কুমার মেঘনাদ অপর পক্ষ; অষ্টাধিক সর্গ ব্যাপিয়া বীর ও করুণাদি প্রধান প্রধান রস যে কাব্যে ওতপ্রোত-ভাবে বিদ্যমান্ এবং চমৎকার-রূপে অভিব্যক্ত,—সে কাব্যকে মহাকাব্য ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? সংস্কৃত-সাহিত্যে কুমারসম্ভব; নৈষধীয়-চরিত, শিশুপাল-

বধ ইত্যাদির ন্যায় বাঙ্গালা-সাহিত্যে মেঘনাদবধও মহাকাব্য। তবে কবি নিজে ইহাকে "মহাকাব্য" না বলিয়া "কাব্য" নামে অভিহিত করিয়াছেন ; ইহাতে তাঁহার বিনয়-গুণ পরিস্ফুট।

গুণ

"গুণ্" ধাতুর এক অর্থ "গুণিত করা" অর্থাৎ বৃদ্ধি সাধন করা, উৎকর্ষ করা। অলঙ্কার-শাস্ত্রে রচনার ধর্ম্ম-বিশেষ, যাহা দ্বারা রসের পুষ্টি হয় এবং রচনা মনোহর হয়, তাহাই "গুণ" বলিয়া খ্যাত। দেহীর পক্ষে শৌর্য্য-বীর্য্যাদি ধর্ম্ম-সকল যেমন আত্মার উৎকর্ষ-সাধক বলিয়া "গুণ" নামে খ্যাত, কাব্যেও তেমনই রচনার মাধুর্য্যাদি ধর্ম্ম সকল, কাব্যের আত্মা-স্বরূপ রসের উৎকর্ষ-সাধন করে বলিয়া "গুণ" বলিয়া কীর্ত্তিত। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে দশবিধ গুণের উল্লেখ আছে।—ওজঃ, মাধুর্য্য, প্রসাদ, শ্লেষ, সমতা, সুকুমারতা, অর্থ-ব্যক্তি, উদারতা, কান্তি ও সমাধি। তন্মধ্যে ওজঃ, মাধুর্য্য ও প্রসাদ—এই তিনই প্রধান।

ওজঃ—রচনায় যে গুণ থাকিলে, তাহা হৃদয়কে উদ্দীপিত করে, তাহাই ওজঃগুণ। বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত ও ভয়ানক রসের অভিব্যক্তিতে এ গুণের সবিশেষ উপযোগিতা। এ কাব্যও সেইজন্য ওজোগুণ-প্রধান। সাহিত্যের ওজোগুণে হৃদয়ে বলাধান হয়। সেইজন্য ওজোগুণাত্মক সাহিত্য পৌরুষ জনক।

মাধুর্য্য—রচনায় যে গুণ থাকিলে, উহা চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তাহাই মাধুর্য্য-গুণ। আদ্য, করুণ ও শান্ত রসে ইহার সবিশেষ উপযোগিতা। এ কাব্যে মেঘনাদ-প্রমীলার কথোপকথন, রামের, রাবণের ও প্রমীলার বিলাপ এবং সীতা ও সরমার কথোপকথন মাধুর্য্য-গুণে মনোহর।

প্রসাদ—রচনায় যে গুণ থাকিলে, উহা শ্রবণমাত্র চিত্তকে রস-সিক্ত করে, তাহাই প্রসাদ-গুণ। এ কাব্যে সীতা ও সরমার কথোপকথনাংশ আদ্যন্ত এই-গুণ-বিশিষ্ট এবং এইজন্যই ঐ অংশ কাব্যাংশে এমন মনোরম হইয়াছে।

রীতি

দেহের অবয়ব-সংস্থানের ন্যায়, রচনায় পদ-সংঘটনকে অলঙ্কার-শাস্ত্রে রীতি বলে। ইংরেজীতে যাহাকে style বলে, ইহা তাহাই। সংস্কৃত ভাষায় দেশ-ভেদে চারি প্রকার রীতি প্রসিদ্ধ—গৌড়ী, বৈদর্ভী, পাঞ্চালী ও লাটী। সেকালে এক-এক প্রদেশে পদ-সংঘটন-ভঙ্গি এক-এক প্রকার ছিল; সেইজন্য দেশ-ভেদে রীতি-ভেদ করা হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালায় তাহা হইতে পারে না। বাঙ্‌লায় পদ-সংঘটন-ভঙ্গি-ভেদেই রীতি-ভেদ করিতে হয়। বাঙ্গালা-আলঙ্কারিক পণ্ডিত ৺জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় এই প্রণালীতে রীতি-ভেদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বাঙ্‌লা ভাষায় রীতি প্রধানতঃ দুই প্রকার;—সাধ্বী ও প্রাকৃতী। রচনা সাধু-ভাষা-প্রধান হইলে, সে রীতিকে সাধ্বী বলে। বাঙ্‌লা-সাহিত্যে প্রধানতঃ এই রীতিই অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। চলিত ভাষা অবলম্বনে রচনা করিলে, সেখানে প্রাকৃতী রীতি কহা যায়। "হুতোম পেঁচার নক্সা" ও "আলালের ঘরে দুলাল" এই রীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নাটকাদিতেও ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়। এ কাব্যখানিতে আদ্যন্ত সাধ্বী রীতিই অবলম্বিত হইয়াছে। এরূপ গম্ভীর মহাকাব্যে প্রাকৃতী রীতির স্থান নাই; তাহা শোভনও হইত না; বরং তাহাতে রসোভঙ্গই হইত।

সাধ্বী রীতি চারি প্রকার;—দাম্ভোলী, হৈমী, দ্বৈমাতুরী ও মাদনী।

দাম্ভোলী—রচনা আড়ম্বরময়-শব্দ-সম্পন্ন ও গম্ভীর হইলে, দাম্ভোলী রীতি। ইহা সংস্কৃত-সাহিত্যের 'গৌড়ী' রীতির অনুরূপ। এ কাব্যে বীর-রৌদ্র-অদ্ভুত ও ভয়ানক রসের পরিস্ফুটনে দাম্ভোলী রীতিই অবলম্বিত হইয়াছে। "দম্ভোলী-নিক্ষেপী" স্বয়ং যে কাব্যের একজন প্রধান উপনায়ক, সে কাব্যের অনেকস্থল দাম্ভোলী-রীতির উদাহরণ হইবারই কথা।

হৈমী—যেখানে রচনা মধুর ও ললিত পদ-সম্পন্ন, সেখানে হৈমী। ইহা সংস্কৃতের বৈদর্ভী-রীতির অনুরূপ। সীতা সরমার কথোপকথনে অনেক স্থলে এই রীতি লক্ষিত হয়।

দ্বৈমাতুরী—দাক্ষোলী ও হৈমীর মিশ্রণে দ্বৈমাতুরী-রীতি। ইহা সংস্কৃতের "পাঞ্চালী" রীতির অনুরূপ। এ কাব্যে বীর-রসের অভিব্যক্তিতে অনেক স্থলে এইরূপ সংমিশ্রণ বিদ্যমান।

মাদনী—রচনা অতি মৃদু-পদ-সম্পন্ন হইলে মাদনী-রীতি। ইহা সংস্কৃতের লাটী-রীতির অনুরূপ। এ কাব্যে সীতা ও সরমার কথোপকথনের অনেক স্থলই ইহার উদাহরণ।

দোষ-পরিচ্ছেদ

কাব্য-সমালোচনায় দোষ-গুণ, দুই-ই বিচার করা অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধান। গুণ-বিচার যথাসাধ্য করিলাম। এখন দোষ-বিচার করিতেছি।

দেহীর পক্ষে যেমন কাণত্ব-খঞ্জত্বাদি, কাব্য-পুরুষের পক্ষেও দোষ তদ্রূপ। রসই কাব্যের আত্মা; সুতরাং যাহা রসের অপকর্ষ ঘটায়, তাহাই অলঙ্কার-শাস্ত্রে 'দোষ' বলিয়া গণ্য। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা নানাবিধ দোষকে নানা নামে শ্রেণিবদ্ধ করিয়াছেন। এখানে আমি কয়েকটী প্রধান-প্রধান দোষের উল্লেখ করিতেছি।

ছন্দোদোষ—অধিকাক্ষর, ন্যূনাক্ষর, যতি-ভঙ্গ ও মাত্রা-পাত—এই চারি প্রকার ছান্দোদোষের মধ্যে এ কাব্যে যতি-ভঙ্গের বা মাত্রা-পাতের বিশেষ সম্ভাবনা নাই; কারণ অমিত্রচ্ছন্দে যতি নির্দ্দিষ্ট-নিয়মাধীন নহে এবং বাঙ্‌লা চতুর্দ্দশাক্ষরী পয়ারে মাত্রার অর্থাৎ লঘু-গুরুর কোন নিয়ম নাই। তবু, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, মধুসূদন অনেক স্থলেই ছন্দের সুর রক্ষা করিবার জন্য হ্রস্ব-দীর্ঘের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন ;—

"নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা।" (১ম সর্গ)
"দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে" (৪র্থ সর্গ)

এই-সব স্থলে হ্রস্ব-দীর্ঘ-ঘটিত পদের সমুচিত সমাবেশে ছন্দের সুর সুন্দর রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই এরূপ সম্ভব হয় নাই। সেই-সেই স্থলে এক-প্রকার মাত্রা-দোষ ঘটিয়াছে, বলিতে হয় ;—

একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে
ভ্রমিতেছিনু কাননে, দূর গুল্ম-পাশে
চরিতেছিল হরিণী।"—— (৪র্থ সর্গ)

এখানে "ভ্রমিতেছিনু" ও "চরিতেছিল" পদদ্বয়ে মাত্রা-পাত হওয়ায় উহা অন্যান্য স্থলের ন্যায় শ্রুতিমধুর হয় নাই।

অধিকাক্ষর—এ কাব্যে কোথাও এ দোষ লক্ষিত হয় না। কয়েক স্থলে, যেখানে 'বৎস', 'বৎসর', 'উৎস', 'কুজ্‌ঝটিকা' ইত্যাদি আছে, সেখানে দৃশ্যতঃ পনর অক্ষর হইলেও, 'ৎস' বা 'জ্‌ঝ', উচ্চারণে এক অক্ষর বলিয়াই গণ্য। সুতরাং তাহাতে ছন্দোভঙ্গ হয় নাই।

ন্যূনাক্ষরতা—এ কাব্যে কোথাও নাই।

পদ-ও-বাক্য-দোষ—

শ্রুতিকটুতা—ঠিক শ্রুতিকটু না হইলেও স্থলে-স্থলে দুর্ব্বোধ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় ;—'যাদঃ-পতি-রোধঃ', 'দেব-ওদন', 'প্রক্ষ্বেড়ন' ইত্যাদি। বীর-

রসাদিতে দুঃশ্রব শব্দের ব্যবহার আছে; কিন্তু তাহা দোষাবহ না হইয়া গুণ বলিয়াই গণ্য।

অশ্লীলতা—কবি এ বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হইলেও দুই-এক স্থলে, কথায় না হউক, ভাবে শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করিয়া ফেলিয়াছেন;—অষ্টম সর্গে কামুক ও কামুকী প্রেতদিগেব কাম-লীলা বর্ণনা অশ্লীল-ভাবাপন্ন।

গ্রাম্যতা—গ্রাম্য শব্দের ব্যবহার এ কাব্যে ক্বচিৎ দুই-এক স্থলে দৃষ্ট হয়;—"খেদাইছে", "ভাঁড়াইলা" ইত্যাদি। নবম সর্গে সীতার উক্তিতে "হাদে দেখ" গ্রাম্য হইলেও, স্ত্রীলোকের মুখে অশোভন হয় নাই।

নিহতার্থতা—শব্দের যে অর্থ অপ্রচলিত, সেই অর্থে সেই শব্দের প্রয়োগ। 'বল্লভ' পদ প্রিয়ার্থ-বাচক হইলেও, প্রায়ই প্রণয়ীতে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু এ কাব্যে প্রিয়ার্থে পুত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে;—

কৃত্তিকাকুল-বল্লভ সেনানী—(২য় সর্গ)

'জগদম্বা' মাতৃ-বাচক হইলেও সচরাচর কেবল দুর্গা ও কালীদেবীকেই বুঝায়। এ কাব্যে এক স্থলে লক্ষ্মীকে 'জগদম্বা' বলা হইয়াছে—(৬ষ্ঠ সর্গ)।

অবাচকতা—যে শব্দের অর্থে যাহা বুঝায় না, তাহা বুঝাইতে সেই শব্দের প্রয়োগ। "উৎস রজঃছটা",—"সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ-কান্তি-ছটা"—এখানে এবং সর্ব্বত্রই (মধুসূদনের অন্যান্য কাব্যেও) রজতার্থে 'রজঃ' ব্যবহৃত হইয়াছে।

অন্তর্নিহিত অর্থে "অন্তরিত" ("অন্তরিত পরাক্রমে"); পিধানার্থে "নিকষ" ("নিকষে যথা অসি"); নাশকার্থে 'নশ্বর' ("মরে নর কাল-ফণী-নশ্বর দংশনে"—"নশ্বর সংগ্রামে"); প্রতারণার উদ্দেশে রোষার্থে "প্রতারিত রোষ"—এই গুলি অবাচকতা-দোষের উদাহরণ।

এক টীকাকার "লঙ্কা, হৈমবতী পুরী" স্থলে "হৈমবতী"—অর্থে পার্ব্বতী বুঝিয়া এখানে 'অবাচকতা-দোষ' বলিয়াছেন। বস্তুতঃ "হৈমবতী" অর্থে এখানে হেম-

নির্ম্মিত-অলঙ্কার-বিশিষ্টা। স্থতরাং, এখানে কবির উক্তিতে অবাচকতা-দোষ না হইয়া বরং টীকাকারেরই অবাচ্যতা-দোষ হইয়াছে। এই কাব্যেই অন্যত্র আছে—"হৈমবতী উষা" অর্থাৎ উষা তরুণারুণ-রাগ-রঞ্জিতা বলিয়া যেন হৈমালঙ্কার-বিশিষ্টা।

অনুচিতত্তা—মহতের সহিত ক্ষুদ্রের তুলনা অনুচিত। এ কাব্যে কোন-কোন স্থলে এই দোষ ঘটিয়াছে;—

"হ্রেষিল অশ্ব মগন হরষে,
দানব-দলিনী-পদ্মপদযুগ ধরি'
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি।"—(৩য় সর্গ)

অন্যত্র—

"সে রক্ষেন্দ্রে, রাঘবেন্দ্র, রাখে পদতলে
বিমোহিনী দিগম্বরী যথা দিগম্বরে!"— (৩য় সর্গ)

উন্মত্ততার বর্ণনায়—

"——কভু বা
উলঙ্গ, সমর-রঙ্গে হর-প্রিয়া যথা"— (৮ম সর্গ)

নিরর্থকতা—বর্ণিতব্য বিষয়ের অনুপযোগী কিংবা অর্থহীন শব্দ বা বাক্যের প্রয়োগ;—

"হে কৃত্তিকে হৈমবতি।"— (৫ম সর্গ)

এখানে হৈমবতী পার্ব্বতীই কবির লক্ষ্য। কিন্তু কৃত্তিকা ও হৈমবতী একজন নহেন; সুতরাং 'কৃত্তিকে' নিরর্থক।

"———সুরপতি-সহ
তারক-সূদন যেন শোভিল দুজনে,
কিম্বা ত্বিষাম্পতি-সহ ইন্দু সুধানিধি।"— (৩য় সর্গ)

এখানে "শোভিল" নিরর্থক। কারণ, সূর্য্যের সহিত চন্দ্রের একত্র 'শোভা' পাওয়া অসম্ভব।

ক্লিষ্টতা—নানা শব্দের যোজনা-দ্বারা অভিপ্রেত অর্থের প্রকাশ। সমুদ্র তট বুঝাইতে "যাদঃ-পতি-রোধঃ" ; মেঘনাদ বুঝাইতে 'অসুরারি-রিপু" ।

চ্যুত-সংস্কৃতি—ব্যাকরণ-দুষ্ট পদের প্রয়োগ ;—"প্রফুল্লিত", "সত্রাসে" যথাক্রমে 'প্রফুল্ল' ও 'ত্রাসে' হওয়া উচিত। "শিরোপরি" ব্যাকরণ দুষ্ট।

অধিকপদতা—এক শব্দে যাহা বুঝায়, তাহার জন্য সেই শব্দের সঙ্গে আর-এক বা ততোধিক শব্দের ব্যবহার ;—"অবগাহে দেহ"। এখানে 'দেহ' পদটি অধিক ; কারণ, 'অবগাহে' বলায় জলে দেহ নিমজ্জন বুঝাইয়া থাকে।

"শুনি সে সু-আরাধনা, নগেন্দ্র-নন্দিনী,
আনন্দে, তথাস্তু বলি আশীষিলা মাতা !"—(৬ষ্ঠ সর্গ)

এখানে, 'নগেন্দ্র নন্দিনী আশীষিলা' ; সুতরাং 'মাতা' অধিক পদ।

"অশ্রুময় আঁখি পুনঃ কহিল রাবণ,
মন্দোদরী-মনোহর,—কহ রে সন্দেশ-
বহ"———— (১ম সর্গ)

এখানে, 'রাবণ' বলিয়া আবার 'মন্দোদরী-মনোহর' বলার কোন সার্থকতা নাই। শুধু অনুপ্রাসের লোভে, 'সন্দেশ' এর খাতিরে 'মন্দোদরী'।

ন্যূনপদতা—প্রয়োজনীয় পদের অভাব ;—

"——শঙ্খ, চক্র, গদা,
চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ ,——(৬ষ্ঠ সর্গ)

এখানে, চতুর্থ ভুজের জন্য, 'পদ্ম'—এই পদের অভাব। তিনটি পদার্থ 'চতুর্ভুজে'—বিসদৃশ হইয়াছে।

অর্দ্ধান্তরৈকপদতা—একটি পদের একাংশ এক চরণের শেষে এবং অপরাংশ দ্বিতীয় চরণের আরম্ভে ব্যবহার ;—

"—— কহ, রে সন্দেশ-
বহ" —————— .(১ম সর্গ)

" ——— ইন্দ্রতুল্য বলী-
বৃন্দ, চেয়ে দেখ, সাজে।"——(১ম সর্গ)

"শুইলা ফুল-শয়নে সৌরকর-রাশি-
রূপিণী সুর-সুন্দরী।" ———(৫ম সর্গ)

————"সৌরকর রাশি-
সদৃশ কিরীট ;——————"(৯ম সর্গ)

এই-সব স্থলে প্রকৃত-পক্ষে একটি পদকে বিভক্ত করা হয় নাই; সংযুক্ত পদকে বিভক্ত করা হইয়াছে মাত্র। একটী পদ বিভক্ত হইলেই প্রকৃত দোষের হয়।

প্রসিদ্ধি-ত্যাগ—যাহা প্রসিদ্ধ, তাহার পরিহার করিয়া নূতনের প্রয়োগ ;—

"প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব ;—
কনক-মুকুট শিরে ;"—————— (১ম সর্গ)

লঙ্কাযুদ্ধে রামের মস্তকে "কনক-মুকুট" অপ্রসিদ্ধ।

"শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে"—(৪র্থ সর্গ)

কৈলাসে মহাদেবের 'স্বর্ণাসন' অপ্রসিদ্ধ।

নবম সর্গে প্রমীলা সম্বন্ধে আছে ;—

"মর্ত্ত্যে রতি মৃত-কাম-সহ সহগামী।"— (৯ম সর্গ)

বস্তুতঃ, রতি মৃতপতিসহ সহগামিনী হয়েন নাই।

গর্ভিতত্তা—এক বাক্যের মধ্যে বাক্যান্তরের উক্তি ;—

"———কহিল দুর্ম্মতি—
(প্রতারিত রোষ আমি নারিনু বুঝিতে)
"ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আমি কহিনু তোমারে।"—(৪র্থ সর্গ)

এখানে বন্ধনী-বেষ্টিত বাক্যান্তরটিকে বক্ষ্যমাণ বাক্যের মধ্যে প্রবিষ্ট করান হইয়াছে।

"——কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈমগেহে ?'——— (১ম সর্গ)

এখানে, 'তোব দুঃখে দুঃখী'—এই বাক্যান্তরটিকে মূল বাক্যেব মধ্যে প্রবিষ্ট করান হইয়াছে।

এ কাব্যে যে-কয়েক স্থলে গর্ভিততা আছে, তাহা ইংরেজীর অনুকরণে। সুতরাং, উহা ইংবেজী-শিক্ষিতদের কাছে মন্দ লাগে না।

দূরান্বয়—ক্রিয়াপদের সন্নিহিত না হইয়া দূবে অর্থাৎ বাক্যান্তরের পরে কর্ম্মাদিব অবস্থান।

"-——কহ কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে ?"

এখানে, 'রেখেছ' ক্রিয়ার কর্ম্ম 'ধনে'; কিন্তু দুইয়েব মধ্যে ব্যাক্যান্তরদ্বয়—'কাঙ্গালিনী আমি' ও 'রাজা' ব্যবধান হইয়াছে।

"কুল, মান, প্রাণ মোর রাখ, হে, উদ্ধারি,
রঘু-বন্ধু, রঘু-বধু, বদ্ধা কারাগারে।"—(৭ম সর্গ)

এখানে, 'উদ্ধারি' ক্রিয়ার কর্ম্ম 'রঘুবধূ'; কিন্তু মধ্যে সম্বোধন-পদ 'রঘু-বন্ধু' ব্যবধান থাকায় দূরান্বয় হইয়াছে। কিন্তু এরূপ দূরান্বয়ে অর্থ-গ্রহণের ব্যাঘাত হয় না। যেরূপ দূবান্বয় হইলে তাহা হয়, তাহাই প্রকৃত দোষের। এ কাব্যে সেরূপ দূরান্বয় দৃষ্ট হয় না।

অর্থদোষ—

ব্যাহতত্ব—একই বিষয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখাইয়া, পরে তাহার অন্যথা-করণ ;—

"আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ?
পশিব লঙ্কায় আমি নিজ ভুজ-বলে ;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি ?"—(৩য় সর্গ)

এখানে, রাঘবকে 'ভিখারী' বলিয়া, ক্ষণপরেই আবার 'নৃমণি' বলায় উৎকর্ষ-কথন দ্বারা অপকর্ষ-কথন ব্যাহত হইয়াছে।

খ্যাতি-বিরুদ্ধতা—যাহা লোক-প্রসিদ্ধ বা কবি-প্রসিদ্ধ, তাহার বিরুদ্ধ ভাব-ব্যঞ্জনা ;—

"শোভিল মুকুতাপাঁতি সে চিকণ কেশে,
চন্দ্রমার রেখা যথা ঘনাবলী-মাঝে,
শরদে !"——— ——— (৭ম সর্গ)

শরতের মেঘ শুভ্র বলিয়াই প্রসিদ্ধ ; সুতরাং, উহার সহিত এখানে (কৃষ্ণবর্ণ) কেশের উপমা খ্যাতি-বিরুদ্ধ হইয়াছে।

রস-দোষ—

বিরুদ্ধ-রস-বিভাব-পরিগ্রহ—কোন রসের মধ্যে যদি বিরোধী রসের বিভাবাদি আসিয়া পড়ে, তবে মূল-রসের অপকর্ষ হয় বলিয়া, উহা দোষ-মধ্যে গণ্য ;—

তৃতীয় সর্গে সখিবৃন্দের প্রতি প্রমীলার সম্ভাষণ চমৎকার বীর রসাত্মক ; কিন্তু তন্মধ্যে—

"অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা ; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে ?

চল সবে, রাঘবের হেরি বীরপণা,
দেখিব যে রূপ দেখি শূর্পণখা পিসী
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটী বনে।"—(৩য় সর্গ)

এই আস্য-রসাত্মক বর্ণনা আসিয়া পড়ায় এখানে রস-দোষ ঘটিয়াছে।

অকাল-রস-ব্যঞ্জনা—যে সময়ে যে রস অশোভন, সেই সময়ে সেই রসের অভিব্যক্তি ;—

নবম সর্গে সামরিক শ্মশান-যাত্রাকালে শোকাকুলা চেড়িবৃন্দ-মধ্যে প্রমীলার ঘোড়া (বড়বা) চলিয়াছে ;—

"প্রমীলার বীরবেশ শোভে ঝল-ঝলে
বড়বার পৃষ্ঠে—অসি, চর্ম্ম, তূণ, ধনুঃ,
কিরীট, মণ্ডিত, মরি, অমূল রতনে !
সারসন মণিময় ; কবচ খচিত
সুবর্ণে,—মলিন দোঁহে——শারসন, স্মরি,
হায় রে, সে সরু কটি—কবচ, ভাবিয়া
সে সু-উচ্চ কচযুগে—গিরিশৃঙ্গ-সম !—(৯ম সর্গ)

এখানে, ঘোর করুণ-রসের অভিব্যক্তির মধ্যে আস্য-রসের বিভাব-বর্ণনা নিতান্তই অশোভন ও অনুপভোগ্য।

প্রকৃতি-বিপর্য্যয়—দেবতাদি দিব্য নায়ক-নায়িকার সম্ভোগাদি বর্ণন করিলে, দেব-প্রকৃতি ও দেব-মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় ; এইজন্য ইহা দোষ বলিয়া গণ্য ;—

দ্বিতীয় সর্গে হর-পার্ব্বতী সম্বন্ধে এই দোষ ঘটিয়াছে। উহা সংযত ও ইঙ্গিত-মাত্র হইলেও অনুপভোগ্য।

অঙ্গাতিবিস্তৃতি—মূল বিষয়ের কোন-এক অঙ্গের অতি-বিস্তৃত বর্ণনা ;—

অষ্টম সর্গে অতি-দীর্ঘ নরক-বর্ণনাটি এই দোষে দুষ্ট। কবি অন্যান্য দৃশ্য-বর্ণনায় যেরূপ সংযত, এখানে সেরূপ হয়েন নাই। নরক-বর্ণনার মধ্যে আবার ক

প্রেতিনীদিগের বর্ণনাও অতি-বিস্তৃতি-দোষে দুষ্ট। পরন্তু, উহা অশ্লীলভাবাপন্ন ও অপ্রিয়-রসাভাস-দুষ্ট।

উহাকে বীভৎস-রস বলিলেও অতি-বিস্তৃতি-দোষ ঘটে এবং বীভৎস-রসে অতি-বিস্তৃতি একান্তই অসহ্য।

অনৌচিত্য—রস-অঙ্গে কতকগুলি 'অনৌচিত্য'-দোষ কথিত হইয়া থাকে—দেশানৌচিত্য, কালানৌচিত্য, অবস্থানৌচিত্য, বয়োনৌচিত্য, জাত্যনৌচিত্য, পাত্রানৌচিত্য ইত্যাদি। প্রথম সর্গে কাব্যারম্ভে রাবণের সভা-বর্ণনায়, যে-সভায় শতশত পাত্রমিত্রাদি "নতভাবে" বসিয়া আছেন, সেই সভায় সুচারু চামর ঢুলাইবার সময়ে কিঙ্করীর "আনন্দে" মৃণাল-ভুজ আন্দোলন অবস্থানুচিত হইয়াছে।

এ কাব্যে পাত্রানৌচিত্য দোষ স্থানে-স্থানে বিদ্যমান্। যেথানে পাত্র-পাত্রীর কথা বা কার্য্য সেই পাত্র বা পাত্রীর পক্ষে অনুচিত, সেইখানে পাত্রানৌচিত্য-দোষ।

দ্বিতীয় সর্গে, জননী-স্বরূপা পার্ব্বতীর কাছে সবিস্তারে আদ্য-রসের ভাষায় মোহিনী-মূর্ত্তির রূপ-বর্ণনা করা মদনের মুখে অশোভন; সুতরাং অনুচিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ সর্গে, গোপনে নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে সশস্ত্র লক্ষ্মণের প্রবেশ, দৈবাস্ত্রে সজ্জিত হইয়াও, মেঘনাদ-নিক্ষিপ্ত কোষার আঘাত নিবারণে অক্ষমতা; নিরস্ত্র মেঘনাদকে হত্যা;—এ সকলই বীর-চরিত্রের পক্ষে পাত্রানুচিত। পাশ্চাত্য কাব্যাদির অনুকরণে লুব্ধ হইয়াই, কবি এই প্রমাদে পড়িয়াছেন। ইহাতে লক্ষ্মণেব বীর-চরিত্র ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। যদিও, যে-রাবণ রাম-লক্ষ্মণের অজ্ঞাতসারে ছলনা ও বল-প্রয়োগ দ্বারা অবলা হরণ করিয়াছে, সেই রাবণের পক্ষ হইয়া যে যুদ্ধ করিতেছে, তাহার প্রতি ন্যায়-আচরণের তত প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না; যদিও পাপীর প্রতি শাস্তি-বিধানে ন্যায়-যুদ্ধই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয় না; যদিও রাক্ষসের সহিত যুদ্ধে ক্ষত্র-ধর্ম্ম পালনেরও অবশ্য-কর্ত্তব্যতা লক্ষিত হয় না—লক্ষ্মণ নিজেই মেঘনাদকে এ সকল কথা বলিয়াছেন,—

"———জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর ; ক্ষত্রধর্ম্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে ?" ——— ——— ———(৬ষ্ঠ সর্গ)

—তবু দৈবাস্ত্রে সজ্জিত হইয়াও মেঘনাদ-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত কোষার আঘাত নিবারণে লক্ষ্মণ অক্ষম হইলেন এবং সে আঘাতে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া 'ভূতলে' পড়িয়া গেলেন ; পরে মায়া-দেবীর যত্নে চেতনা পাইবার পরে যখন যুদ্ধ চলিতে লাগিল, তখন মেঘনাদ শঙ্খ-ঘণ্টাদি লক্ষ্মণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে থাকিলে, দৈবাস্ত্র-বলে বলী লক্ষ্মণকে কষ্ট করিয়া সেগুলি নিবারণ করিতে হইল না ;—মায়াদেবীই 'বাহু প্রসারণে' সে-সব ফেলিয়া দিতে থাকিলেন ! ইহাতে লক্ষ্মণের বীর-চরিত্রকে সবিশেষ খর্ব্ব করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কবি এ কাব্যে লক্ষ্মণকে বীর-ভাবে দেখান নাই, এমন নহে ;—সর্ব্বত্রই লক্ষ্মণ 'বীর-কেশরী', 'রৌদ্র দাশরথি'। পঞ্চম সর্গে বিভীষিকাময় বনবাজি-মাঝে মহাদেবকেও লক্ষ্মণ বীরের ন্যায় যুদ্ধার্থ সগর্ব্বে আহ্বান (Challenge) করিয়াছেন ; মহাদেবও 'বাখানি সাহস তোর' বলিয়া 'বিনা রণে' পথ ছাড়িয়া দিয়াছেন। মেঘনাদ-বধের পরে, যখন রুদ্র-তেজে পূর্ণ রাবণ লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাঁহাকে শক্তিশেলে আহত করেন, তখন সে যুদ্ধে রুদ্র-তেজঃ-শালী রাবণকেও বলিতে হইয়াছে—

"বাখানি বীরপণা তোর আমি,
সৌমিত্রি-কেশরি !"———(৭ম সর্গ)

তবু কবি মেঘনাদের সহিত যুদ্ধে, বোধ হয়, কেবলমাত্র পাশ্চাত্য কাব্য-নাটকের অনুকরণের বশবর্ত্তী হইয়াই লক্ষ্মণকে হীন করিয়া ফেলিয়াছেন। Shakespeare তাঁহার "Troilus and Cressida" নামক নাটকে "নিরস্ত্র" Hector-কে Achilles-কর্ত্তৃক নিহত করাইয়াছেন। যাহা হউক, ইহা মেঘনাদবধের দুরপনেয় কলঙ্ক।

এ কাব্যের রাম-চরিত্র সম্বন্ধেও অনেকে ঐরূপ দোষারোপ করিয়া থাকেন। সেইজন্য এই দোষ-পরিচ্ছেদে সে কথারও আলোচনা করিতে হইতেছে।—

তৃতীয় সর্গে, প্রমীলা ও তাঁহার চেড়িবৃন্দ লঙ্কাভিমুখে চলিয়া গেলে, বিভীষণের কাছে রামের উক্তি—"দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে" ইত্যাদি বীরের পক্ষে অনুচিত ভয়-ব্যঞ্জক বলিয়া ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে দূতীর প্রতি রাম যাহা কহিয়াছেন, সেই বীরোচিত-সৌজন্য-ব্যঞ্জক উক্তির সহিত সংযোজনা করিয়া দেখিলে, পরে বিভীষণের কাছে 'ডরিনু' ইত্যাদি কথাগুলি কাপুরুষতা-ব্যঞ্জক বলিয়া বোধ হয় না; উহা ভয়ের ভাষায় বিস্ময়-প্রকাশ মাত্র। কারণ, রমণীর এরূপ বীর-ভাব রামের পক্ষে অদৃষ্টপূর্ব্ব; সুতরাং বিস্ময়-জনক।

যখন রুদ্র-তেজ-পূর্ণ রাবণ রামকে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আসিতে দেখিয়া স্পর্দ্ধার সহিত বলিলেন—

"———না চাহি তোমারে
আজি, হে বৈদেহীনাথ! এ ভব-মণ্ডলে
আর একদিন তুমি জীব নিরাপদে।"——(৭ম সর্গ)

তখন রাম 'না রাম, না গঙ্গা' কিছুই বলিলেন না। কেহ-কেহ বলেন যে, ইহাও রামের ন্যায় বীরের পক্ষে অনুচিত হইয়াছে। কিন্তু এখানে ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, মহাদেবের আদেশে আজ রাবণ 'মহারুদ্রতেজে পূর্ণ'। এই রুদ্র-তেজের কাছে দেব-বীর্য্যও নিষ্ফল;—সেনানী কার্ত্তিকেয়কেও যুদ্ধে বিরত হইতে হইয়াছে! রাম নীরব থাকিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি? বিশেষ, যখন রাবণ আজ রামের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিতেছেন না, তখন 'বীর' রামের পক্ষে নীরবতাই বরং শোভন হইয়াছে।

লক্ষ্মণের জন্য সমধিক ভয়-ব্যাকুলতা ও কাতরতাও বীর রামের পক্ষে অনুচিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভাবিতে হইবে যে, এ কাব্যে রামের বীরত্ব দেখাইবার অবসর নাই। কারণ, লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক মেঘনাদ-বধ এবং রাবণ কর্ত্তৃক লক্ষ্মণকে শক্তিশেলে বিদ্ধনই এই কাব্যের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়। সুতরাং, রাম এ কাব্যে "সুভ্রাতৃবৎসল" রূপেই চিত্রিত। অযোধ্যা-ত্যাগ-কালে সুমিত্রা, লক্ষ্মণকে রামের হস্তে ন্যাস-স্বরূপই দিয়াছেন। সুতরাং, লঙ্কার বনরাজি-মাঝে চণ্ডীর

দেউলে গিয়া চণ্ডীপূজা করা যে কি ভয়ানক ব্যাপার, বিভীষণের মুখে তাহা শুনিয়া, লক্ষ্মণের জন্য রামের ভয়-ব্যাকুলতাই রামের ন্যায় ভ্রাতৃবৎসলের পক্ষে স্বাভাবিক।

অষ্টম সর্গে, মূর্চ্ছাগত লক্ষ্মণকে কোলে করিয়া রামের বিলাপ ভ্রাতৃবৎসলতার চমৎকার অভিব্যক্তি। যাহাকে সুমিত্রা-মাতা ন্যাস-স্বরূপ রামের হাতে সমর্পণ করিয়াছেন, যাহার জন্য তিনি সুমিত্রা-মাতার কাছে দায়ী, তাহাকে ছাড়িয়া কি সীতার উদ্ধার? এই দায়িত্ব ভাবিয়াই রাম বিলাপ করিতে-করিতে বলিয়াছেন—

"——চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি" –(৮ম সর্গ)

এই উক্তিতে রামের বীরত্বে আঘাত লাগে নাই; বরং তাঁহার ভ্রাতৃত্বই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই স্থলে অন্যান্য রাময়ণ-কবিরাও এইরূপেই রামকে লক্ষ্মণের জন্য বিলাপ করাইয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ কাব্যে রামের বীরত্ব দেখাইবার অবসর নাই। তবু কবি ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর সহিত রামের যুদ্ধে রামের বীরত্ব-বর্ণনা করিতে ভুলেন নাই;—

"অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ সরোষে
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া,
বৃষ-স্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে"— (১ম সর্গ)

নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে মেঘনাদের সহিত যুদ্ধে লক্ষ্মণকে হীন করা হইয়াছে, সত্য; কিন্তু রামকে এ কাব্যে হীন করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বরং ভ্রাতৃ-বৎসল রামের ভ্রাতৃবৎসলতা অতি সুন্দর-রূপেই দেখান হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একথাও বলিতে হইতেছে যে, রামায়ণেও রাম-লক্ষ্মণের চিত্র একেবারে নির্দ্দোষ নহে। বনবাসের আজ্ঞায় পিতার প্রতি লক্ষ্মণের অযথা ঘোরতর উষ্মা, * নিতান্তই পুত্রানুচিত এবং স্ত্রীলোক শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন বীর-চরিত্রের আদর্শ নহে। লঙ্কা-যুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণ বীরত্বে সর্ব্বত্রই যে রাবণ, মেঘনাদ

* হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসক্তমানসম্। (বাঃ রাঃ—২।২১।১৯)

বা অন্যান্য রাক্ষস-বীর অপেক্ষা মহত্তর, তাহাও রামায়ণে দেখি না। মেঘনাদ কর্ত্তৃক নাগপাশ-বন্ধনে রাম-লক্ষ্মণকে বিষ্ণু-প্রেরিত গরুড়ের সাহায্যে রক্ষা পাইতে হইয়াছিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণেও দেখা যায়, লঙ্কা-যুদ্ধে রাম-পক্ষকে নানা সময়ে নানা কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছে;—শুধু বীরত্বে কুলায় নাই। বস্তুতঃ, মানুষ এবং মানুষের কৃত অন্যান্য কার্য্যের ন্যায়, কাব্য-নাটকও নির্দ্দোষ হয় না। বাল্মীকি-ব্যাসে দোষ আছে, কালিদাস-ভবভূতিতে, সেক্‌স্‌পীয়ার্-মিল্টনে, হোমার্-ভার্জ্জিলে—সকল কাব্যেই দোষ লক্ষিত হয়। মধুসূদনও এ নিয়মের বহির্ভূত নহেন। কিন্তু গুণাংশে বাঙ্গালায় আর-একখানি কাব্য নাই, যাহা ইহার সমকক্ষ হইতে পারে। বলা আবশ্যক, মধুসূদনের কাব্যে যিনি কোনরূপ বিশ্ব-সমস্যা বা তাহার পূরণ অন্বেষণ করিবেন তিনি বঞ্চিত হইবেন। কেবল-মাত্র রসের দিক্ দিয়াই মধুসূদন তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন; সুতরাং কেবল-মাত্র রসের দিক্ দিয়াই তাঁহার কাব্যের বিচার ও আস্বাদন করিতে হইবে। এ কাব্যে তিনি রামায়ণের এক অতি-করুণ ও বীররসাত্মক অংশ অবলম্বনে তাহারই রসচিত্র (artistic presentation) দিয়াছেন। আদ্য-রস ছাড়া, বীর-করুণাদি প্রধান ও পরম উপভোগ্য রসগুলি এ কাব্যে চমৎকার রূপে অভিব্যক্ত;—বীর ও করুণে বঙ্গ-সাহিত্যে ইহা এখন পর্য্যন্ত অদ্বিতীয়। বঙ্গমাতার প্রতি কবি একদিন নিবেদন করিয়াছিলেন—

> "তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ গুণ ধর,
> অমর করিয়া বর, দেহ দাসে সুবরদে।
> ফুটি যেন স্মৃতি-জলে, মানসে, মা, যথা ফলে
> মধুময় তামরস, কি বসন্ত কি শরদে।—(বঙ্গভূমির প্রতি)

বঙ্গ-জননী কবির নিবেদন শুনিয়াছেন। গৌড়জন তাঁহার কাব্যের দোষ ভুলিয়া গুণই ধরিয়াছেন এবং যতদিন বঙ্গভাষা বিদ্যমান্ থাকিবে, ততদিন অমর কবির এই কাব্যখানি বাঙ্গ্লা-সাহিত্য-সরোবরে 'মধুময় তামরস'-স্বরূপ চির-প্রস্ফুটিত হইয়া রহিবে।

—o—

তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য

বেলগেছিয়া রঙ্গমঞ্চে যখন পণ্ডিত রাম নারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত রত্নাবলী নাটকের অভিনয়োদ্যোগ হইতেছিল, তখন একদিন মধুসূদন তাঁহার বন্ধু গৌর-দাসের সহিত কথায়-কথায় গর্ব্বোক্তি করিয়া হঠাৎ বাঙ্গালা নাটক লিখিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ইহার পরেই মধুসূদন দুইখানি নাটক ও তৎপরে দুইখানি প্রহসন রচনা করেন।*

নাটক-রচনায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন করা মধুসূদনের একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু প্রথমে তিনি সাহসী হন নাই। শর্ম্মিষ্ঠা নাটক রচনার পরে, একদিন যতীন্দ্র মোহনের (মহারাজা সার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর) সঙ্গে কথোপকথনে এই প্রসঙ্গ উঠিল। বাঙ্গালা ভাষা অমিত্রচ্ছন্দের উপযোগী নয়, যতীন্দ্রমোহন এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন। মধুসূদন কিন্তু দৃঢ়ভাবে উত্তর দিলেন যে, "সংস্কৃত-জননীর দুহিতা বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের চলন কখনই অসম্ভব নহে।" উত্তরে—যতীন্দ্রমোহন বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি লিখুন, তাহা মুদ্রণের ব্যয়ভার আমি বহন করিব।" ইহার পরে পদ্মাবতী রচনা-কালে তিনি যেন অতি সন্তর্পণে উহাতে স্বল্পমাত্রায় অমিত্রচ্ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার পর, প্রহসন দুই খনি সমাপ্ত করিয়াই, তিনি সাহসে ভর করিয়া আগাগোড়া অমিত্রচ্ছন্দে একখানি কাব্য লিখিতে যত্নবান্ হইলেন। ইহারই ফলে "তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য।" প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ লিখিয়াই তিনি যতীন্দ্রমোহনকে দেখাইলেন। মধুসূদন বাঙ্গালায় অকস্মাৎ শর্ম্মিষ্ঠা-নাটক লিখিলে তাঁহার বন্ধুগণ যেমন চমৎকৃত হইয়াছিলেন, অমিত্র-

---

* প্রথমে শর্ম্মিষ্ঠা নাটক ও তৎপরে পদ্মাবতী নাটক। শর্ম্মিষ্ঠা নাটকখানি বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে মহাসমারোহে অভিনীত হইয়াছিল। প্রহসন দুইখানির নাম—"একেই কি বলে সভ্যতা" ও "বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ"।

ছন্দে এই তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ পড়িয়া তাঁহারা ততোধিক চমৎকৃত হইলেন। বন্ধুদিগের কাছে উৎসাহ পাইয়া মধুসূদন তাঁহার স্বাভাবিক ক্ষিপ্রহস্তে আরও দুই সর্গ লিখিয়া সমগ্র কাব্যের হস্তলিপিখানি যতীন্দ্রমোহনের হস্তে প্রদান করিলেন। যতীন্দ্র মোহন সাদরে উহা গ্রহণ করিয়া আজীবন উহাকে মহারত্নজ্ঞানে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে উহাকে Victoria Memorialএ উপহার স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ এখন ঐ হস্তলিপি উক্ত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বিদ্যমান। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে কথায়-কথায়—মধুসূদন যেন বাজী রাখিয়াই তিলোত্তমা-সম্ভব-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এ সব কথা তাঁহার জীবনী-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। প্রথমে, ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা "বিবিধার্থ সংগ্রহে" প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে চারি সর্গে সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়া ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত হয়।

এই পয়ার-প্লাবিত দেশে অকস্মাৎ এক নূতন প্রকার ছন্দে বাঙ্গালা কাব্য বাহির হওয়াতে তাৎকালিক বিদ্বজ্জন-সমাজে একটা তুমুল কল্লোল-কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল। তখন কাহারও মনে হয় নাই এবং সেই কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া মনে হইবার সম্ভাবনাও ছিল না যে, দোষ-গুণ লইয়া এই কাব্যখানি বাঙ্গালা-সাহিত্যে একটা সম্পূর্ণ নূতন ধরণে, পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত যে নব-যুগেব প্রবর্ত্তন করিতেছে, ইহা সেই উদীয়মান নব-যুগের অগ্রদূত মাত্র হইয়া অদৃশ্যে ঐ যুগের অর্থাৎ পাশ্চাত্য প্রভাবের নূতন পতাকা বহন করিতেছে। এ কথা কবি স্বয়ং এবং ইংরেজী শিক্ষিত জন-কয়েক ভিন্ন অনেকেরই ধারণায় আসে নাই। এবং আসে নাই বলিয়াই তাঁহারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে কবিকে লাঞ্ছিত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। কিন্তু এ বিষয়ে কবির প্রতীতি এমন সুদৃঢ় ছিল যে, তিনি ঐ-সব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ঐ অমিত্রচ্ছন্দেরই সুপরিণতি দেখাইয়া সমস্ত কোলাহল নিরস্ত

করিতে যত্নবান হয়েন। ইহারই ফলে, মেঘনাদবধ কাব্য যখন প্রকাশিত হইল, তখন আপনা-আপনি সমস্ত কোলাহল থামিয়া গেল। অন্ততঃ ছন্দ-সম্বন্ধে কোলাহল আর রহিল না। ঐ নূতন ছন্দের আবৃত্তি-কৌশল না জানাতেই যাহা কিছু গোল বাধিয়াছিল। বাস্তবিক, পয়ারের সুরে পয়ারের যতি রক্ষা করিয়া অমিত্রচ্ছন্দ পড়িতে গেলে কখনই ভাল লাগিতে পারে না, ভাল লাগা দূরে থাক্, অতি অদ্ভুতই শুনায়, ইহাই ছিল সেই গোলমালের মূলকথা। এমন কি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত গুণগ্রাহী পণ্ডিতও প্রথম-প্রথম ঐ কারণেই তিলোত্তমার প্রতি বিরূপ ছিলেন। পরে, তিনি উহার আবৃত্তি অভ্যাস করিয়া তবে ঐ ছন্দের গুণ বুঝিতে পারেন।— পরে মেঘনাদবধ প্রকাশিত হইলে, তিনি ঐ ছন্দের পক্ষপাতীই হইয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের সকলে সেরূপ হইতে পারেন নাই। "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব"-লেখক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন-মহাশয় শুধু আবৃত্তি-কৌশল না জানাতেই ঐ ছন্দের গুণানুভবে বঞ্চিত ছিলেন। তিলোত্তমা-সম্ভবে কবিত্বের অভাব নাই, উত্তম উত্তম অলঙ্কারও আছে,—এ সব কথা স্বীকার করিয়াও তাৎকালিক "পণ্ডিত"-সম্প্রদায় শুধু ঐ নূতন ছন্দের জন্য ঐ কাব্যখানিকে আদর করিতে পারেন নাই।

এই কাব্যখানি সম্বন্ধে সেই সময়ে ও তৎপরবর্ত্তী সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মনীষীগণ কর্ত্তৃক লিখিত যে কয়টী উল্লেখ-যোগ্য সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি ক্রমান্বয়ে উদ্ধৃত করা গেল। প্রথমেই রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সমালোচনা। কাব্যখানি প্রকাশিত হইবা মাত্র তিনি তাঁহার 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' ঐ কাব্যের সমালোচনা করেন।—

"বিবিধার্থের পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের প্রথম দুই সর্গ প্রকটিত করা হয়; তাহার পাঠে সহৃদয় ব্যক্তিরা কিরূপ সম্প্রীত হন, ইহাই নিরূপণ করা তৎকালে কাব্য-লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। সে অভিপ্রায় মনোমত সিদ্ধ হওয়াতে সম্প্রতি অপর দুই সর্গ সমভিব্যাহারে সুধিবর দত্তজ মহাশয় অভিনব কাব্য চারি সর্গে সম্পাদিত করিয়াছেন। ইহার প্রথম সর্গের প্রকটন সময়ে আমরা

লিখিয়াছিলাম যে, "ইহার রচনাপ্রণালী অপর সকল বাঙ্গালী কাব্য হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে ছন্দ ও ভাবের অনুশীলন ও অন্ত্য যমকের পরিত্যাগ করা হইয়াছে। ঐ উপায়ে কি পর্য্যন্ত কাব্যের ওজোগুণ বর্দ্ধিত হয়, তাহা সংস্কৃত ও ইংরেজী কাব্য-পাঠকেরা জ্ঞাত আছেন; বাঙ্গালীতে সেই ওজোগুণের উপলব্ধি করা অতীব বাঞ্ছনীয়; বর্ত্তমান প্রয়াসে সে অভিপ্রায় কি পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা সহৃদয় পাঠকবৃন্দ নিরূপিত করিবেন।" আমরা স্বয়ং তৎকালে কাব্যের দোষ-গুণের সমালোচনা করিতে পারিতাম না, কারণ আমরাই তাহা প্রকটিত করিয়াছিলাম; কিন্তু এইক্ষণে দত্তজ তিলোত্তমাকে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশিত করায়, আমাদিগের আর সে প্রতিবন্ধক নাই। অতএব এস্থলে অভিনব কাব্যের রচনা-বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করায়, বোধ হয়, পাঠকবৃন্দের পরিতৃপ্তি হইতে পারে।

সাহিত্যকারেরা রসাত্মক বাক্যকেই * কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; সেই রসের বিশেষ উদ্দীপনার্থে কবিরা তাঁহাদের রসাত্মক বাক্য সকল নানাবিধ মিতাক্ষরে অর্থাৎ ছন্দে নিবন্ধিত করিয়া থাকেন, এবং ছন্দের লক্ষণ এই যে, রচনাকে নির্দ্দিষ্ট সঙ্খ্যক পদ বা চরণে বিভক্ত করিয়া ঐ চরণে নির্দ্দিষ্ট সঙ্খ্যক মাত্রা বা বর্ণ ও যতি বা বিরাম রাখিতে হয়। দেশ, ভাষা ও পাঠকদিগের রুচি ভেদে ঐ ছন্দের বিবিধ রূপান্তর হইয়া থাকে। সংস্কৃতে ঐ রূপান্তর করণার্থে ছন্দের বর্ণ, মাত্রা ও যতির পরিবর্ত্তন করা হয়; সুতরাং বর্ণ, যতি ও মাত্রাই ছন্দের আত্মা; তদভাবে ছন্দ হয় না। ছন্দের অলঙ্কার-স্বরূপে কোন কোন ছন্দের এক চরণের শেষ অক্ষরের সহিত অপর চরণের শেষ অক্ষরের অনুপ্রাস করা হয়; কিন্তু তাহা ছন্দের অঙ্গ নহে। এই বাক্যের প্রমাণার্থে আমরা সমস্ত সংস্কৃত কাব্যের উদ্দেশ করিতে পারি। ঐ সকল কাব্য ছন্দে রচিত, অথচ তাহাতে অন্ত্যানুপ্রাস প্রায় নাই। কবিকুল-পিতামহ বাল্মীকি স্বীয় রামায়ণে ঐ অনুপ্রাসের প্রয়োগ একবার মাত্রও করেন নাই। বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারতেও তাহার অনুসরণ করিতে বিরত হন।

* বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। সাহিত্য-দর্পণ। ১ প্র, ৩ সূত্র।

কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষাদি নব্য কবিরাও তাহার অনুরাগী নহেন। এই সকল দৃষ্টান্তে স্পষ্টই অনুভূত হইবে যে, অন্ত্যানুপ্রাস কবিতার সামান্য অলঙ্কার মাত্র, তাহা কোন মতে অবশ্য-প্রয়োজনীয় নহে। ইহা স্বীকর্ত্তব্য বটে যে, বঙ্গভাষায় অদ্যাপি যে সকল কবিতা প্রকটিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই অন্ত্যানুপ্রাস-বিশিষ্ট; কিন্তু তাহাতে অন্ত্যানুপ্রাসের অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা সাব্যস্ত হইতে পারে না; যেহেতু বাঙ্গালীর ছন্দোমালা পরিপূর্ণ নহে; তাহার সম্পূরণার্থে সর্ব্বদা নূতন ছন্দঃ প্রস্তুত করা ও সংস্কৃত ছন্দঃ-সকল গ্রহণ করা হইতেছে; অতএব দত্তবাবু বাঙ্গালী কাব্যের পদ হইতে মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন করায় বোধ হয় সহৃদয় ব্যক্তিরা অসন্তুষ্ট হইবেন না। কেহ ইহা প্রশ্ন করিতে পারেন যে, অন্ত্যানুপ্রাস অলঙ্কার মাত্র, কবির স্বেচ্ছায় তাহার ত্যাগ হইতে পারে; পরন্তু সে ত্যাগ করিবার কারণ কি? অপর, অন্ত্যানুপ্রাস সুখশ্রাব্য, তাহাতে সত্বরে অর্থের বিকাশ হয়, অধিক দূর অবধি বাক্যের আসক্তির নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে হয় না; যাহারা গদ্যরচনা অত্যল্প মাত্র বুঝিতে পারে, তাহাদিগের পক্ষে অনুপ্রাসের সাহায্যে পয়ারাদি ছন্দোগত ভাব অনায়াসে বোধগম্য হয়; তাহার পরিত্যাগের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্ন সকল আশু উৎকট বোধ হইতে পারে; পরন্তু তাহার উত্তর নিতান্ত অসাধ্য নহে। কবির স্বেচ্ছানুসারে অন্ত্যানুপ্রাসের পরিত্যাগ হইতে পারে, এই স্বীকারে প্রথম প্রশ্নের সদুত্তর অনায়াসে উপলব্ধ হইবেক। অপর, অনেক সহৃদয় ব্যক্তি দীর্ঘ-কাব্য-পাঠে প্রতি চতুর্দ্দশ অক্ষরের পর অনুপ্রাসকে শ্রবণ-সুখকর না বলিয়া নিয়ত স্বর-সমানতা-প্রযুক্ত অপ্রিয় জ্ঞান করেন; কোন কোন বাঙ্গালী কবি ঐ স্বরসাম্যের নিরাকরণার্থে এক কাব্যে নানা ছন্দ ব্যবহৃত করেন; তদন্যথায় সংস্কৃত, ইংরাজি, লাটিন ও গ্রীক মহাকবিদিগের অনুকরণে অনুপ্রাসের ত্যাগ শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে। অধিকন্তু, পয়ার ছন্দে প্রতি চতুর্দ্দশ অক্ষরের শেষে অর্থের সমাপ্তি করিতে হয়। তাহার অনুরোধে মনোগত ভাবের সঙ্কোচ হইয়া উঠে, কল্পনাশক্তি শব্দাভাবে বহুদূর ব্যাপন করিতে পারেন না, উজ্জ্বল ভাব খর্ব্ব হয়, কাব্যের গৌরবের লাঘব হয় এবং ওজোগুণের হানি হয়। অনুপ্রাসের

প্রতিবন্ধক না থাকিলে কবিরা এক বাক্যকে যতদূর ইচ্ছা ততদূর দীর্ঘ করিতে পারেন ; যেস্থানে ইচ্ছা সেই স্থানে বাক্য শেষ করিতে পারেন ও যে পরিমিত শব্দে আপনার ভাব সুপরিব্যক্ত হয়, তাহাবই গ্রহণ করিতে পারেন ; কদাপি পাদ-পূরণের নিমিত্ত বৃথা শব্দের প্রয়োগ বা প্রয়োজনীয় শব্দের পরিত্যাগ করিতে প্রণোদিত হয়েন না। ফলতঃ, দত্তজ যথার্থ লিখিয়াছেন যে, মিত্রাক্ষর কবিতার নিগড়। তাহার পরিত্যাগে কবিতা কামাবচর হইতে পারেন।

অপর, ঐ নিগড় সত্ত্বে কবিতায় ওজোগুণের সংবৃদ্ধি হইতে পারে না। ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, বাঙ্গালী কবির মধ্যে ভারতচন্দ্র যেমত কবিতার লালিত্য অনুভূত করিতে পারিতেন, এমত আর কোন কবিই পারেন নাই। তিনি শব্দের গৌরব ও অর্থের গৌরব অতি চমৎকৃতরূপে সমাহিত করিয়া রাগ-দ্বেষাদি-প্রকাশ-কবণ-সময়ে তদুপযুক্ত গম্ভীর, কর্কশ, ভয়ানক শব্দ, ও কোমল ভাবের জ্ঞাপনার্থে সুমধুর, কোমল মৃদুশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অতি অল্প বাঙ্গালী কবি এ বিষয়ে তাঁহার সহিত তুলনীয় হইতে পারেন। শিবেব দক্ষালয়ে যাত্রা-সময়ের বিবরণ-মধ্যে শব্দার্থের সমন্বয়-বিষয়ক একটী অপরূপ উদাহবণ আছে ; তাহার পাঠে আমাদিগের অভিপ্রেত অনায়াসে পাঠকদিগের বোধগম্য হইবে। ঐ বর্ণনায় সতীর দেহত্যাগ-সংবাদে মহাদেব ভয়ঙ্কর কোপে ভূত-প্রেত-পরিচারক সমভিব্যাহারে দক্ষালয়ে আগমন করিয়া কি করিতেছেন, তদ্বিষয়ে লিখিত আছে—

"অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরেরে অরে দক্ষ দেরে সতীরে।"

এই ভূজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে ভয়ানক কোপজ্ঞাপক অর্থের সহিত শব্দেব সাম্যত্ব সকলেই স্বীকার করিবেন ; কিন্তু পয়ার, কি অন্য কোন বাঙ্গালী ছন্দে, তাহার সমাধা হয় না ; ভারত-সদৃশ কবিও তাহার চেষ্টা করিয়া পরাস্ত হইয়াছেন। দেখুন, বিদ্যা কোপান্বিতা হইয়া তিরস্কার-করণ-সময়ে ছন্দের অনুরোধে

"শুন লো মালিনী কি তোর রীতি।

কিঞ্চিৎ হৃদয়ে না হয় ভীতি ।
এত বেলা হৈল পূজা না করি ।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি ।”

ইত্যাদি বাক্যে কি প্রকার শব্দ ও ভাবের বিরোধ করিয়াছেন। বিদ্যা “মায়ের আগে” ক্রন্দন করিয়া মালিনীর নামে অভিযোগকরণ সময়ে এরূপ বাক্য কহিলে হানি ছিল না ; তিরস্কারের নিমিত্ত ইহা নিতান্ত অপ্রযোগ্য—মধুরভাষিণী কামিনীর উক্তি বলিলেও ইহার দোষ খণ্ডিত হয় না। পরন্তু, ইহা যে কেবল ছন্দ ও অনুপ্রাসের অনুরোধে ঘটিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ভারতচন্দ্র যদ্যপি অন্ত্যানুপ্রাস ত্যাগ করিয়া এই কবিতা লিখিতেন, তাহা হইলে এ দোষ কদাপি হইত না। এই অনুরোধেও আমিত্রাক্ষর কবিতার উপযোগিতা উপলব্ধ হইতেছে, এবং দত্তজ বাঙ্গালাতে তাহার প্রচার করাতে এতদ্দেশীয় সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন বলিয়া মানিতে হইবে।

ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য যে, অন্ত্যযমক থাকিলে কবিতা যেরূপ অনায়াসে বোধগম্য হয়, অন্ত্যযমক বিরহে সেরূপ সুখবোধ্য হইতে পারে না ; সুতরাং অন্ত্যানুপ্রাসবিশিষ্ট কবিতা যেরূপ অনভিজ্ঞ পাঠকের নিকট সমাদৃত হয়, অন্ত্যানুপ্রাসবিহীন কাব্য তাদৃশ হইবেক না। পরন্তু, ইহা স্মর্তব্য যে, সকল কবিতাই অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিমিত্ত প্রস্তুত হয় না ; এবং ধীমান ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত তদ্যোগ্য কবিতা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। বালকের দুগ্ধফেন ভীমের উপযুক্ত খাদ্য নহে। বোধ হয়, এতদ্দেশীয় পণ্ডিত মহাশয়েরা বাঙ্গালী কবিতার নাম শুনিলেই “ভাষা” বলিয়া পরিত্যাগ করেন, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাঁহারা কালিদাস, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির কবিতা পাঠ করণান্তর অর্থের গৌরবহীন পয়ার নিতান্ত ইতরবৃত্তি মনে করেন।

কথিত হইয়াছে যে, অন্ত্যানুপ্রাস ত্যাগ করিলে কবি যেস্থানে ইচ্ছা সেই স্থানে বাক্যের সমাপ্তি করিতে পারেন, ইহাতে আশু বোধ হইতে পারে, এবং কোন কোন সম্পাদকের বোধ হইয়াছে যে, অমিত্রাক্ষর কবিতায় যতির ভেদ নাই ; কিন্তু তাহা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। কাব্যের প্রধান অঙ্গ অক্ষর বা মাত্রা, বৃত্তি ও যতি ;

আমরা তাহা অবশ্য প্রয়োজনীয় বোধ করি; এবং আমাদিগেব আধুনিক কবি দত্তজও তাহার বিরুদ্ধমতাবলম্বী নহেন। পরন্তু, যতির অনুরোধে যে অন্যত্র বাক্যশেষে যতিভঙ্গ হয়, ইহা আমরা বোধ করি না। নিয়মিত স্থানে যতি রাখিয়া, পরে তথায় বা অন্যত্র পদের শেষ হইবার পূর্ব্বেই বাক্য শেষ করিলে যতিভঙ্গ হয় না, ইহাই আমাদের বক্তব্য। তাহার উদাহরণার্থে আমরা এক চরণান্তর্গত প্রশ্নোত্তরবিশিষ্ট কবিতার উদ্দেশ করিতে পারি; তাহাতে আমাদিগের বাক্য সপ্রমাণ হইবে। তদ্ভিন্ন সামান্য কবিতায়ও তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। দেখুন, কুমারসম্ভবের ৪র্থ সর্গের ৫ম শ্লোক যথা—

"উপমানমভূদ্বিলাসিনাং
করণং যত্তব কান্তিমত্তয়া।
তদিদং গতমীদৃশীং দশাং
ন বিদীর্য্যে—কঠিনাঃ খলু স্ত্রিয়ঃ।"

এস্থলে চতুর্থ পাদের 'ন বিদীর্য্যে' পদেব পরই অর্থের শেষ হইয়াছে। "কঠিনাঃ খলু স্ত্রিয়ঃ" বাক্যের সহিত পূর্ব্ব বাক্যেব বৈয়াকরণীয় কোন আসত্তি নাই, অথচ ঐ স্থান ছন্দের যতি স্থান নহে। রঘুবংশে যথা—

"সোঽহমাজন্মশুদ্ধানামাফলোদয়কর্ম্মণাম্,
আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবর্ত্মনাম্,
যথাবিধি হুতাগ্নীনাং যথাকামার্চ্চিতার্থিনাম,
যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকালপ্রবোধিনাম্,
ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্,
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্,
শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্,
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তিনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্,
রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে" —১ম সর্গ, ৫—১০ শ্লোক।

এই বাক্যেও ইহার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইবে। ইহাতে "বক্ষ্যে" পদেই অর্থের শেষ

হইয়াছে; শ্লোকপাদের শেষ কথায় অন্য প্রসঙ্গ; তাহার সহিত পূর্ব্ব কথার সমন্বয় নাই। রঘুবংশের অন্যত্র—

"সমমেব সমাক্রান্তং দ্বয়ং দ্বিরদগামিনা
তেন—সিংহাসনং পিত্র্যমখিলং চারিমণ্ডলং।"—৪র্থ সর্গ ৪ শ্লোক।

এই শ্লোকেও "তেন" পদে অর্থের শেষ হইয়াছে, অথচ সেই স্থান যতির নহে। কিরাতার্জ্জুনীয়ে যথা—

কৃত প্রণামস্য মহীং মহীভুজে
জিতাং সপত্নেন নিবেদয়িষ্যতঃ
নবিব্যথে তস্য মনঃ—নহি প্রিয়ং,
প্রবক্তুমিচ্ছন্তি মৃষা হিতৈষিণঃ॥'

এই শ্লোকে তৃতীয় পাদের "মনঃ" পদে অর্থের শেষ হইয়াছে। তৎপরের "নহি প্রিয়ং" ইত্যাদি বাক্যের সহিত তাহার কোন সমন্বয়ই নাই। এতাদৃশ অপর দৃষ্টান্ত অনেক সংগ্রহ করা যাইতে পারে; পরন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। প্রদত্ত উদাহরণেই পাঠকবৃন্দ নিশ্চিত হইবেন যে, পদমধ্যে অর্থের শেষ করায় হানি হয় না, এবং তিলোত্তমায় যে পদের প্রারম্ভে বা মধ্যে যে সকল বিরাম আছে, তাহা কোন মতে প্রকৃত যতির হানিকর নহে। দত্তজ লেখেন—

"এ হেন নির্জ্জন স্থানে দেব পুরন্দর,
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা,
বীণাপাণি। কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে,
নমিয়া জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি।"

এই পাদ-চতুষ্টয়ের তৃতীয় পাদের 'বীণাপাণি' পদে অর্থ শেষ হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে যতির ভঙ্গ হয় নাই; যেহেতু তিলোত্তমার ছন্দঃ অমিত্রাক্ষর পয়ার, তাহার লক্ষণ চতুর্দ্দশাক্ষর বৃত্তি, অষ্টমাক্ষরে যতি, এবং এই লক্ষণ রক্ষা পাইলেই ছন্দের রক্ষা মানিতে হইবে। সেই লক্ষণানুসারে "স্থানে", 'আজি', 'দেবি' ও 'তোমা', পদের

পর যতি আছে ; সেই যতিতেই ছন্দের অনুরোধ রক্ষা পায় ; 'বীণাপাণি' শব্দের পর পৃথক যতি থাকায় তাহার হানি হয় না। যদ্যপি এই নিয়মের অন্যথায় অষ্টমাক্ষরের পর যতি না থাকে, তাহা হইলে কাব্যকর্ত্তাকে যতি-ভঙ্গ-দোষ স্বীকার করিতে হইবে। এক পদে চতুর্দ্দশাক্ষরের অধিক বা অল্প থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ছন্দোভঙ্গ অঙ্গীকার করিতে হয়।

প্রস্তাবিত ছন্দের পাঠ করিবার নিয়ম স্বতন্ত্র। সামান্য পয়ারের ন্যায় ইহা পাঠ করিলে অর্থেরও অনুভব হইবেক না এবং কাব্যও পদ্য বলিয়া বোধ হইবেক না। যাঁহারা ইংরাজী ভাষা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা যে প্রকারে মিল্‌টন্ কবি কৃত "প্যারাডাইস্ লষ্ট" নামক কাব্য পাঠ করেন, তদ্রূপে ইহার পাঠ করিলে সিদ্ধকাম হইবেন। অন্যের প্রতি বক্তব্য যে, তাঁহারা পয়ারের অষ্টম ও চতুর্দ্দশাক্ষরে যতি রাখিয়া, বাক্যার্থের শেষ হইলে পৃথক্ যতি রাখিলেই তিলোত্তমা-পাঠে সুখী হইতে পারিবেন। ফলতঃ, যে প্রকারে বিরামচিহ্নানুসারে গদ্য পাঠ করা যায়, সেই প্রকার অমিত্রাক্ষর-পয়ার পাঠ করিতে হয় ; কেবল ইহার বিরাম-চিহ্ন ব্যতীত ছন্দের দুই যতি আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

তিলোত্তমার ছন্দ ও যতি বিষয়ে এতাবন্মাত্র লিখিয়া তাহার রচনা-কৌশল ও কবিত্ব সম্বন্ধে আমাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বিবিধার্থের শেষ প্রস্তাবে সমালোচন আরম্ভ করিলে প্রায় স্থান সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। সুতরাং আমাদিগের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করিতে হইবে। ইহাতে আমাদিগের বিশেষ আক্ষেপ নাই ; যেহেতু এতৎপত্রের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব খণ্ডে দত্তজর কবিত্ব বিষয়ে আমাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত আছে। এস্থলে এইমাত্র বলিলে হয় যে, দত্তজর কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যে প্রশংসাবাদ করিয়াছিলাম, তাহা সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইয়াছে। তিলোত্তমার যে কোন স্থানে নয়ন নিঃক্ষেপ করা যায়, তাহাতেই প্রকৃত কবির লক্ষণ বিলক্ষণ প্রতীত হয়। সর্ব্বত্রই সুচারু-রসাত্মক ভাব অতি প্রোজ্জ্বল বাক্যে বিভূষিত হইয়াছে। ঐ ভাব সকল দত্তজ ভুবনবিখ্যাত কালিদাস, ভবভূতি, হোমর, মিল্‌টন্ প্রভৃতি কবিকুল কেশরিদিগের

রচনা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন ; কিন্তু বঙ্গভাষায় তাহার বিভাষণে দত্তজ কেবল অনুবাদ করিয়া নিরস্ত হয়েন নাই ; তাঁহার মন হইতে অন্যের যে কোন ভাব নিঃসৃত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার স্বাভাবিক কল্পনাবৃত্তির কৌশলে নূতন অবয়ব ধারণ করিয়াছে ; কিছুই প্রাচীন বলিয়া অনাদরণীয় বোধ হয় না ; প্রত্যুত, সকলই হৃদ্য, দীপ্তিময় ও প্রীতিকর অনুভূত হয়। লালিত্য বিষয়ে বোধ হয়, তিলোত্তমা অতি প্রসিদ্ধ হইবেক না। তথাপি, পৌলোমীর খেদ-উক্তির সহিত তুলনা করিলে অতি অল্প বাঙ্গালা কাব্য পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারে। দত্তজ পৌরাণিক ভূগোল ও খগোল পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে ভূমণ্ডলের প্রান্তভাগে প্রেরণ করায় কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, এবং পৌলোমীর সহচরীর মধ্যে ষষ্ঠি, মনসা সুবচনীর উল্লেখ সহৃদয়ের কার্য্য হয় নাই। অপর, অনেক স্থানে তুলনা ও বিশেষণ, তথা সর্ব্বেশ্যা তিলোত্তমাকে "সতী" বলিয়া বর্ণনা দূষিত মানিতে হয়। পরন্তু, ঐ সকল আপত্তি-সত্ত্বেও আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে, বর্ত্তমান কাব্য বঙ্গভাষার প্রধান কাব্য-মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই, এবং সহৃদয় কাব্যানুরাগীরা ইহার পাঠে অবশ্যই বিশেষ সন্তৃপ্ত হইবেন। তাহা না হইলে, ইহার মঙ্গলাচরণে আমরা কদাপি জনৈক সহৃদয়াগ্রগণ্যের নাম দেখিতাম না।"

এই কাব্য-সম্বন্ধে রাজনারায়ণবাবুর এক পত্রের উত্তরে—মিত্র মহাশয় তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন,—

"Your opinion of Madhu's poem is entirely my own, and Jatindra Mohan Tagore a man of well-cultivated taste, and an excellent judge of poetry, whom perhaps you know, concurs with me. It is the first and a most successful attempt to break through the jingling monotony of the পয়ার and as a poem the best we have in the language. The ideas are no doubt borrowed and Keats and Shelly and Kalidas and Milton have been largely, very largely, put in requisition; but as you very justly say, "whatever passes through the crucible of the author's mind receives an original shape," so the reader has no opportunity to notice, much less to find fault with, the mosaic character of the materials which

go to the making up of Tilottama. The author can never expect a wide circle of readers, but then he must console himself by the reflection that Milton is not the most popular author in English.

রাজনারায়ণ বাবু এই কাব্যের একটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা লিখিয়া Indian-Field নামক পত্রে উহা প্রকাশিত করেন এবং কবিকেও লেখেন,—

"If Indra had spoken Bengali, he would have spoken in the style of the poem ; The author's extraordinary loftiness and brilliancy of imagination, his minute observation of nature, his delicate sense of beauty, the uncommon splendour of his diction and the rich music of his versification charm us in every page. It is an intellectual treat of the first description. Compared to it, what are "Lucent syrups tinct with cinnamon ?" As all natural objects and all the Gods lent their respective chief attractions to the Hindu pandora better than that of grandmother-like old garrulous Hesoid, because from her nostrils flowed as from the charms of Epimetheus but good only, so all sublime things and beautiful—the sky, the ocean, the mountain, the rainbow, the Zephyr, the lotus—as well as all the great masters of song--Vyas and Valmiki, Homer and Virgil, the Hebrew Prophets and Dante, Tasso and Milton, Kalidas and Shakespeare have contributed their respective quotas to the composition of the 'Tilottama'; but as the divine skill of Vishwakarma enabled him to combine and arrange his store of materials in such a manner as to produce a peerless masterpiece of female beauty, so your extraordinary genius has enabled you to arrange your immense store of sublime and beautiful sentiments and images into one harmonious and original whole and produce a masterpiece of poetry that will delight mankind from generation to generation.

How sublime is the commencement of the poem ! How beautiful, how touchingly tender is the episode of Night, Sleep and Dream ! * * How feelingly true the allegory of Veneration and Prayer' (1) and how sublime the description of Hell in the third ! How steadily majestic is the Second Book, rapturously inspired the Fourth ! * * * With

(1) ব্রহ্মার মন্দিরদ্বারে ভক্তি ও আরাধনা, ব্রহ্মসকাশে যাইতে ও কিছু নিবেদন করিতে হইলে যাঁহাদের সহায়তা লইতে হইয়াছিল। (৩য় সর্গ দেখ)

regard to your style, it is at times silently lofty and majestic as the peak of Dhavala, at others it rushes on like mountain-flood with such impetuousity that one is amazed at the 'thunder of its power," at others again it is soft as the Zephyr dallying with the flowers of spring, at others again it is so musical that we almost fancy a *vina* playing near our ears মুঞ্জরিল কুঞ্জবন গুঞ্জরিল অলি * * * And this is the first poem of the author! We know not what he will achieve afterwards."

সেই সময়ে সোমপ্রকাশ-সম্পাদক স্বর্গীয় পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, সোমপ্রকাশ-পত্রে অমিত্রচ্ছন্দ-সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ;—

"বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষর পদ্য নাই। কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য ব্যতিরেকে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নহে। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি যে সমস্ত পদ্য আছে, তাহা মিত্রাক্ষর। কোন প্রগাঢ় বিষয়ের রচনার তাহা উপযোগী নহে। দেশের দোষে হউক, অথবা অভ্যাসদোষে হউক, আমাদিগের দেশের লোকেরা আদিরসপ্রিয়। পয়ার আদি ছন্দ সেই আদিরসাশ্লিষ্ট রচনারই প্রকৃত উপযোগী। এতদ্দ্বারা প্রগাঢ় রচনা হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রগাঢ় রচনা বিষয়ে সংযুক্ত ও প্রযত্নোচ্চারিত-বর্ণাবলী আবশ্যক, কিন্তু পয়ার আদি ছন্দে তাদৃশ বর্ণাবলী বিন্যাস করিলে, উহার শোভা এককালে দূরে প্রস্থান করে। কোমল, মধুর ও অসংযুক্ত অক্ষর দ্বারা বিরচিত হইলেই উহার শোভা হয়। অতএব প্রগাঢ় রচনার্থ ভিন্নবিধ পদ্য সৃষ্টি নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য-রচয়িতা তাহা নবাবতার করিলেন। এখন যদি অন্যান্য লোকে তাঁহার প্রদর্শিত পথের পথিক হন, অবিলম্বে অমিত্রাক্ষর পদ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিবে ; এবং ঐ পদ্যে নিঃসন্দেহ নানাবিধ ছন্দ আবির্ভাবিত হইবে। এখন প্রগাঢ় রচনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর লোকের মন সুখময় আদিরস সাগরে মগ্ন হইতে তাদৃশ উৎসুক নহে। এখন দিন দিন লোকের মন যেমন উন্নত হইতেছে, তেমনই উন্নত পদ্য সৃষ্টিও আবশ্যক হইয়াছে। অতএব মাইকেল মধুসূদন দত্তের চেষ্টা যথোচিত সময়েই হইয়াছে সন্দেহ নাই।"

তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্য সম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক পুস্তকে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ;—

"এই পুস্তক প্রথমে বহির্গত হইলে আমরা আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হই ; কিন্তু মিষ্টবোধ না হওয়ায় ত্যাগ করি। কিছু দিন পরে কাহারও কাহারও মুখে ইহার প্রশংসাবাদ শুনিয়া আবার ইহা পড়িতে প্রবৃত্ত হই ; কিন্তু আবার ত্যাগ করি ; এইরূপ দুই তিন বার করিয়াও গ্রন্থখানি একবারও আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে পারি নাই। আমরা প্রথমে ইহা পাঠ করিতে পারি নাই বলিয়া কেহ এরূপ বুঝিবেন না যে, তিলোত্তমা রসবতী নহেন ;—ইহাতে উৎকৃষ্ট রস আছে ; কিন্তু সেই রস কর্ণের অনভ্যস্ত কর্কশায়মান নূতন ছন্দ, দুরান্বয়, 'ভূষেন' 'অস্থিরি' 'কাম্ভিল' 'কেলিনু' প্রভৃতি মাইকেলি নূতনবিধ ক্রিয়া-পদে, ব্যাকরণ দোষ প্রভৃতি কণ্টকাবৃত কঠিন ত্বকে এরূপ আচ্ছাদিত যে, তাহা ভেদ করিয়া স্বাদ গ্রহণ করিতে সকলের পক্ষে পরিশ্রম পোষায় না।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় ইহার পরেও এ ছন্দের আবৃত্তি আয়ত্ব করিতে পারেন নাই। মেঘনাদবধ-সমালোচনায় তিনি লিখিয়াছেন,—"আমরা মেঘনাদবধের যে ওরূপ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিলাম, তাহা ছন্দের গুণে নহে—কবিত্বের গুণে। ওরূপ অসাধারণ কবিত্বের প্রশংসা না করিয়া কে থাকিতে পারে?"

ইহার কিছুকাল পরে—সুপ্রসিদ্ধ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার "Literature of Bengal" নামক পুস্তকে এই কাব্যের সমালোচনায় লিখিয়াছেন,—

"When this work in blank verse (Tilottama) appeared, it took the literary world by surprise. The power of diction, the sublimity of conception, and the beauty of description could not be denied; but nevertheless the reading world wondered at the audacity of the writer and could not believe his work to be a success. Ridicule was hurled on the ambitious writer from all sides, contemptuous parodies were published, and writers of Iswar Chandra Gupta's School, as well of the Modern School of Akhay Kumar and Vidyasagar, pronounced the attempt to be

a failure! The eminent Vidyasagar himself, ever ready to appreciate and encourage merit could not pronounce Tilottama a success; writers and critics of humbler merit and less candour ridiculed the writer and condemned the work.

Amidst this storm of opposition and ridicule Madhu Sudan stood unmoved. Never was the greatness of his genius, the loftiness of his purpose, the indomitable strength of his will, more manifest. He was resolved to prove by a higher endeavour and a loftier achievement that he was right, and that the world was wrong It was a repetition of the story of Lord Byron whose earlier poems were condemned, and who retaliated with the might of a giant in his "English Bards and Scotch Reviewers." Only Madhu Sudan retaliated in a nobler manner; he did not abuse his critics; he convinced and silenced them by his success in a higher endeavour.

Among the few who pronounced Madhu Sudan's Tilottama to be a success was Jotindra Mohan Tagore himself. He acknowledged the beauty of the work, owned his defeat, and published the work at his own expense. The eminent Rajendra Lala Mitra, who was issuing the Bibidhartha-Sangraha from 1851 for spreading culture and general information among his countrymen, was another critic who recognised the success of Tilottama. And Raj Narayan Basu, the venerable collaborator of Akhay Kumar Datta, was charmed with the noble performance.

But a sceptical world had to be convinced, and the world was convinced by Madhu Sudan's grander poem, Meghnad-badh, published in 1861. Thus the critics were fairly convinced! The great Vidyasagar admitted his mistake with his accustomed candour, and acknowledged Madhu Sudan's genius and the success of his great endeavour. The voice of ridicule, though not completely silenced, failed to have any effect. All Bengal felt that a new light had dawned on the horizon of the nation's literature, that a genius of the first magnitude had a pp eared."

যে সকল সমালোচনা উদ্ধৃত করা হইল, অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই কাব্যখানি

সম্বন্ধে সমস্ত বক্তব্য কথাই ঐগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। আমি এখানে স্বল্প কথায় বক্তব্য বিষয়গুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া আলোচনা করিতেছি।

ছন্দ

যে অমিত্রাক্ষর-ছন্দে এই কাব্যখানি রচিত, ইংলণ্ডীয় মহাকবি মিল্টন্ প্রণীত Paradise Lost-কাব্যের ছন্দই উহার আদর্শ। বাঙ্গালা আদর্শ মিত্রাক্ষর-পয়ারছন্দে অষ্টমাক্ষরে স্বল্প বিরাম দিয়া এবং কোথাও এক চরণে, কোথাও বা দুই চরণে ভাব সম্পূর্ণ করিতে হয়। কিন্তু অমিত্রাক্ষর-ছন্দে ভাব, নির্দ্দিষ্ট যতি ও চরণের বাধ্য নয়। ভাব যেখানে সম্পূর্ণ হইল, সেই খানেই পূর্ণ যতি। কেহ-কেহ অমিত্রাক্ষর-ছন্দ বলিতে বুঝেন যে, মিত্রাক্ষরের মত চরণদ্বয়ের অন্ত্যানুপ্রাস অর্থাৎ শেষাক্ষরে মিল না থাকিলেই হইল। কিন্তু মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দ সেরূপ নহে। মিত্রাক্ষর পয়ারের মত ভাবকে দুই চরণের মধ্যেই শেষ করিয়া, কেবল চরণদ্বয়ের শেষাক্ষরে মিল না রাখিলেই যে অমিত্রচ্ছন্দ হয়, তাহা মিত্রাক্ষর পয়ার অপেক্ষাও নিকৃষ্ট—কারণ, পয়ারের মিলে কানে যেটুক সুশ্রাব্যতা আনে, উহাতে তাহাও থাকে না। আদর্শ অমিত্রচ্ছন্দ কেবলমাত্র ভাবানুযায়ী। উহাতে ভাবানুযায়ী অন্তর্যতি যথাপ্রয়োজন ত' থাকিবেই, কিন্তু পূর্ণ যতি অর্থাৎ পূর্ণ বিরামস্থল কেবল মাত্র ভাবশেষে,—তা' চরণের আদি, মধ্য বা অন্ত্য, যেখানেই হউক।

এইরূপ অমিত্রচ্ছন্দের প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে ভাবের স্বাভাবিক প্রকাশে কবির পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। এইরূপ ছন্দে ভাব ও তৎপ্রকাশক বাক্য যতির বশে নহে, যতিই ভাব ও বাক্যের বশে। এই ছন্দে ভাব প্রকাশে কবির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকায়, রসোপযোগী শব্দ-ব্যবহারে ও বাক্যবিন্যাসে কোথাও বাধা ঘটে না। এইজন্য সুরচিত অমিত্রচ্ছন্দের কবিতা সর্ব্ববিধ রসের উৎকর্ষ সাধক এবং এইজন্যই উহাকে "*Noblest measure in the languag*" বলা হয়।

শব্দ-সম্পদ

মধুসূদনের তিনখানি অমিত্রচ্ছন্দী কাব্যেই দেখা যায় যে, তিনি এ ছন্দে যুক্তাক্ষর শব্দ প্রয়োগে বিশেষ-রূপেই যত্নবান্। বীররৌদ্রাদি রসে শব্দাড়ম্বর একান্ত আবশ্যক এবং অলঙ্কার-শাস্ত্রের নির্দ্দেশও তাহাই। শব্দের ঝঙ্কারে রসের তরঙ্গ কর্ণ ও হৃদয় উভয়কেই তরঙ্গায়িত করিয়া তুলে। ঐ ঝঙ্কারে কর্ণ এমন পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে যে, মিলের অভাবের দিকে লক্ষ্যই থাকে না। ভাব-প্রকাশের স্বাধীনতার সহিত এই শব্দ-সম্পদ মিলিত হইলে, অমিত্রচ্ছন্দী কবিতা বড়ই সুশ্রাব্য ও সরস হইয়া থাকে। অমিত্রচ্ছন্দ-রচনায় মধুসূদনের এই দিকে পূর্ণ দৃষ্টি ছিল। বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ "আধুনিক সাহিত্য" গ্রন্থে এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, প্রাসঙ্গিক বলিয়া এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"বাংলা যে ছন্দে যুক্তাক্ষরের স্থান হয় না, সে ছন্দ আদরণীয় নহে। কারণ ছন্দের ঝঙ্কার এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য যুক্ত অক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে। একে বাংলা ছন্দে স্বরের দীর্ঘ-হ্রস্বতা নাই, তার-উপরে যদি যুক্ত অক্ষর বাদ পড়ে, তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিহীন সুললিত শব্দ-পিণ্ড হইয়া পড়ে। তাহা শীঘ্রই শ্রান্তিজনক তন্দ্রাকর্ষক হইয়া উঠে, হৃদয়কে আঘাতপূর্ব্বক ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। সংস্কৃত-ছন্দে যে বিচিত্র সঙ্গীত তরঙ্গিত হইতে থাকে, তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘ হ্রস্বতা এবং যুক্ত অক্ষরের বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটী অবগত ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি এবং তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।"

ভাষা

মধুসূদন বাঙ্গালা-রচনায় নূতন ব্রতী হইয়াছিলেন মাত্র। গুরুগম্ভীরভাবে কাব্য রচনায় এই তাঁহার প্রথম প্রচেষ্টা এবং তাহাও আবার সম্পূর্ণভাবে নূতন এক প্রকার ছন্দে,—যাহা বাঙ্গালার মিত্রাক্ষর-ছন্দরীতির কোন নিয়মেরই বশীভূত নহে। এরূপ স্থলে এই কাব্যখানির ভাষায় কর্কশতা ও জড়তা থাকিবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কবি স্বয়ংই ইহা বেশ অনুভব করিয়াছিলেন।

"বিবিধার্থ সংগ্রহে" প্রকাশিত প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গের সহিত প্রথম সংস্করণের ঐ দুই সর্গের পাঠ মিলাইলে দেখা যায় যে, কবি ছত্রে-ছত্রে পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। "I am going to print a plain edition of Tilottoma. I wish to try and improve the text. The versification in many places is rather defective"

পত্রান্তরে, "to tell you the candid truth I find the versification very *kancha* in many places."

তিলোত্তমা-সম্ভব প্রকাশিত হইতে-হইতেই অল্প দিনের মধ্যেই উহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। এই সুযোগে কবি উহার বহু স্থলে পুনর্ব্বার পাঠান্তর করিয়া দ্বিতীয়-সংস্করণ প্রকাশ করেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার পূর্ণ মনস্তৃপ্তি হয় নাই। তাই তিনি ফ্রান্সে থাকিতে "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" লিখিবার কালে তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্যের পুনর্লিখনে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু প্রথম সর্গের খানিক লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, ভাষার কর্কশতা ও জড়তা সত্ত্বেও ছন্দ, শব্দ-সম্পদ ও বাক্যবিন্যাসের গুণে এই কাব্যে ওজো-গুণের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। কবির জীবন-চরিত-লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন,—"যে কেহ, সেই কর্কশভাষার আবরণ ভেদ করিয়া, ইহার মাধুর্য্য অন্বেষণ করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা সম্পূর্ণরূপেই "মেঘনাদবধ-কাব্যের" পূর্ব্বগামী হইবার যোগ্য।" মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দ-রচনার মাধুর্য্য স্তরে-স্তরে বিকসিত হইয়াছে—তিলোত্তমাসম্ভবে প্রথম স্তর, মেঘনাদবধে দ্বিতীয় এবং অবশেষে বীরাঙ্গনায় অর্থাৎ তৃতীয় স্তরে উহা পরকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই স্তর বুঝিতে হইলে, প্রথমে তিলোত্তমা-সম্ভব পাঠ করা আবশ্যক।

আবৃত্তি

অমিত্রচ্ছন্দী কাব্যের রসাস্বাদন করিতে হইলে, প্রথমেই ঐ ছন্দের আবৃত্তি অভ্যাস করিতে হয়। মিত্রাক্ষর কবিতার আবৃত্তি কেবল নির্দ্দিষ্ট যতি ও

চরণের দ্বারা নিয়মিত – সুতরাং বৈচিত্র্যহীন এবং বৈচিত্র্যহীন বলিয়া সহজ। কিন্তু অমিত্রচ্ছন্দের আবৃত্তি সেরূপ নহে। ইহার আবৃত্তি কেবল মাত্র ভাবের দ্বারা নিয়মিত—স্বল্প বিরাম, মধ্যম বিরাম ও পূর্ণ বিরাম—সবই ভাবানুগত এবং স্থলে-স্থলে যে স্বর-বৈচিত্র্যের আবশ্যক হয়, তাহাও ভাবানুগামী। ভিন্ন-ভিন্ন ছেদ দ্বারা ঐ সব ভিন্ন-ভিন্ন বিরামস্থল চিহ্নিত থাকে। ভাবের দিকে লক্ষ্য ও ছেদের সঙ্কেতে দৃষ্টি রাখিয়া এই ছন্দ আবৃত্তি করিতে হয়। যদি সুকবির রচিত হয়, তাহা হইলে স্থলে-স্থলে হ্রস্ব-দীর্ঘের দিকেও দৃষ্টি রাখিয়া তদনুরূপ উচ্চারণ করিলে ছন্দ-মাধুর্য্য আরও পরিস্ফুট হইয়া থাকে; নতুবা সুশ্রাব্য হয় না, নয়তো, ছন্দোভঙ্গ হয়। বলা বাহুল্য যে, কবি যেখানে হ্রস্ব-দীর্ঘের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রচনা করিয়াছেন, আবৃত্তিকালে সেইখানে তদনুসারে উচ্চারণের আবশ্যক। এই ছন্দের আবৃত্তি-কৌশল না জানায়, সেকালে অনেক কাব্য-রসজ্ঞ ব্যক্তিও ইহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত ছিলেন। কাব্যাংশে ইহাতে নানাস্থলে আস্বাদনীয় গুণ উপলব্ধি করিয়াও তাঁহারা, শুধু আবৃত্তি করিতে না পাবায়, এ কাব্যেব রসগ্রহণ করিতে পারেন নাই। অমিত্রচ্ছন্দের আবৃত্তির প্রধান সহায়, উহার ছেদগুলি। ছেদ উঠাইয়া লইলে অমিত্রচ্ছন্দী কবিতার আবৃত্তি করা একেবারেই অসম্ভব। সুরচিত অমিত্রচ্ছন্দী কবিতা সু-আবৃত্ত হইলে, ঠিক যেন তরঙ্গিত ও সঙ্গীত-স্বাদ-বিশিষ্ট গদ্যের ন্যায় শুনায়—ভাবেব টানে উহার গতি এবং ভাবের বিরামে উহার যতি। এই ছন্দের আবৃত্তি, শুনিয়া শিখিতে হয়। এখানে শুধু কৌশলের ইঙ্গিত করা গেল মাত্র। স্থানে-স্থানে ভাবানুযায়ী যে স্বর বৈচিত্র্যের কথা বলিয়াছি, তাহার সন্ধানও কেবল শুনিয়াই শিখিতে হয়। লিখিয়া তাহা শিখান একেবারে অসম্ভব।

কবিত্ব

মধুসূদনের কবিত্ব ও কল্পনা-শক্তির প্রথম পরিচয় এই কাব্যে। কাব্যারম্ভে ধবলাচল বর্ণনা, ধবলাচলেরই মত গাম্ভীর্য্যময়। অভাবাত্মক বর্ণনায় বাস্তবিকই ইহা অনন্যসাধারণ! তৎপরে ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মপুরী, দেবগণের মন্ত্রণা, বিশ্বকর্ম্মা

কর্ত্তৃক বিশ্বের যাবতীয় উপমান-দ্রব্যের সমাহারে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী তিলোত্তমার সৃষ্টি, বসন্ত-প্রাদুর্ভাবে দৈত্যবনের শোভা এবং তন্মধ্যে নিরন্তর-বিস্ময়-চকিতা তিলোত্তমার বিচরণ—এই সকল অতি সুন্দর কবিত্ব সহকারে চিত্রিত। আর কল্পনা, তাহা ত' একেবারে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল-ব্যাপিনী—কখনও হিমাচলের অত্যুচ্চ ধবল-শৃঙ্গে, কখনও ব্রহ্মলোকে, আবার কখনও বা সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক ও নক্ষত্রলোক ভেদ করিয়া যমপুরী ও উত্তরমেরুস্থিত বিশ্বকর্ম্মার পুরী—কল্পনার রথে চড়িয়া কবি সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিয়াছেন। তিলোত্তমাসম্ভবের বহুস্থলই যে কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট এবং সংস্কৃত আদর্শের উপমাদি দ্বারা অলঙ্কৃত, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্য-ক্ষেত্রে অলঙ্কার-প্রয়োগ বিষয়ে মধুসূদনের একটী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সংস্কৃত কাব্যাদির আদর্শে উপমান-উপমেয়ের সমলিঙ্গতা রক্ষা করিতে তাঁহার যেরূপ প্রয়াস, তাহা বাঙ্গালা অন্য কাব্যাদিতে বড়-একটা দেখিতে পাওয়া যায় না।

দেবচরিত্রাঙ্কনেও মধুসূদন চমৎকার কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—মন্ত্রণা-সভায় প্রত্যেক দেবের বক্তৃতা তদুচিতই হইয়াছে; তাহাতে সেই-সেই দেবের বৈশিষ্ট্য উত্তমরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যম ও পবনের বক্তৃতা পড়িবার কালে তাঁহাদিগকে মূর্ত্তিমন্ত বীররস ও রৌদ্র-রস বলিয়াই মনে হয়। এইরূপ অন্যান্য দেবের কথায় তাঁহাদের স্ব-স্ব প্রকৃতি ও গুণ সুন্দররূপে অভিব্যক্ত। দেবপতি ইন্দ্র দেবপতিরই উপযুক্ত,—ধীর, গম্ভীর, নিজপদের দায়িত্বে পূর্ণ সজ্ঞান, আশ্রিতবৎসল ও করুণার্দ্রচিত্ত। পৌরাণিক ইন্দ্র অপেক্ষা তিলোত্তমা-সম্ভবের ইন্দ্র সমধিক সদ্‌গুণসম্পন্ন এবং অন্যান্য দেবচিত্রও সবিশেষ সমুজ্জ্বল।

কাব্যদোষ

যে-কোন কবির প্রথম রচনায় দোষান্বেষণ করিতে যাওয়া সুবিচার-সঙ্গত নয়; বিশেষতঃ মধুসূদনের, যিনি আদৌ বাঙ্গালা-রচনায় অভ্যস্ত ছিলেন না। তবে, এ কাব্যে স্থানে-স্থানে যে দোষ পাঠককে পীড়িত করে,—যে দোষ থাকায় ভাববোধে ব্যাঘাত ঘটে, সেই "দুরান্বয়"-দোষ উল্লেখযোগ্য। এ দোষ-বশতঃ এই

কাব্যের অনেক স্থলে "প্রসাদ"গুণের অভাব হইয়াছে। এ দোষও কিন্তু কবির নবীনতা-জনিত—তখন ভাষার উপরে তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা জন্মায় নাই, ভাব প্রকাশে ভাষা তখনও তাঁহার "হস্তামলকবৎ" হয় নাই বলিয়া। উপমাদি অলঙ্কারগুলি কবিজনোচিত হইলেও স্থানে-স্থানে প্রয়োগ-দোষে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; কোথাও বা জড়তাময় ভাষায় একাধিক উপমা স্তূপীকৃত হওয়ায় ভাবটী যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কবি নূতন ব্রতী ভাবিয়া এ কাব্যে উহা মার্জ্জনীয়। তারপর, "ভূষেণ" প্রভৃতি যে সব ক্রিয়াপদকে ন্যায়রত্ন মহাশয় "মাইকেলি নূতনবিধ ক্রিয়াপদ" বলিয়া উপহাস করিয়াছেন, সেগুলি ঠিক "নূতনবিধ" নয়। বাঙ্গালা প্রাচীন কাব্যাদিতে আছে—'নির্ম্মিল', 'নিবারয়ে', 'মোহিলা', 'বুড়াইলে' এমন কি, ভারতচন্দ্র 'কুলুপিল' ক্রিয়াপদও ব্যবহার করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে 'কটাক্ষিয়া', কাশীরামের মহাভারতে 'ত্যাগিতে', 'নমস্কারি' পাওয়া যায়। মধুসূদন এইরূপ কতকগুলি ক্রিয়াপদের সংখ্যা বাড়াইয়াছেন মাত্র। একটু অভ্যস্ত হইলে, সেগুলিকে তত দুঃশ্রাব্য বলিয়া বোধ হয় না। ন্যায়রত্ন মহাশয় এই কাব্যের ব্যাকরণ-দোষেও ব্যথিত হইয়াছেন। বাঙ্গলায় প্রকৃত-পক্ষে ব্যাকরণ নাই। এমন স্থলে, ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিগণের লিখিত বাঙ্গালায় যে সংস্কৃত-ব্যাকরণানুযায়ী—(এস্থলে 'ব্যাকরণানুযায়িনী' বলিলেই শুদ্ধ হইত) বিশুদ্ধতা সর্ব্বত্র রক্ষিত হইবে, এরূপ আশা করা বৃথা। মধুসূদনের কাব্যগ্রন্থে "প্রফুল্লিত", "বন্দুরাকার" ইত্যাদি কয়েকটি ব্যাকরণ-দুষ্ট পদ কাব্যের খাতিরে মার্জ্জনীয়। বাঙ্গালায় ব্যাকরণ না থাকায়, এই নবযুগের গদ্য-সাহিত্যেও লেখকগণ কিরূপ যথেচ্ছাচার করিয়াছেন তাহা কি ন্যায়রত্ন মহাশয় লক্ষ্য করেন নাই? শুধু মধুসূদনকে দোষ দিলে চলিবে কেন? ব্যাকরণ-অভাবেই এই দোষ বাঙ্গালা-সাহিত্যে ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে—এবং এইরূপই হইবার কথা। আমি ব্যাকরণ-দোষের সমর্থন করিতেছি না। এই প্রসঙ্গে কেবল ঐ দোষের কার্য্য-কারণতত্ত্ব নির্দ্দেশ করিলাম মাত্র।

যুগ-প্রবর্ত্তন

ভারতচন্দ্রীয় যুগের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের চিতাধূম সাহিত্যাকাশে বিলীন হইতে-না-হইতে 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব' প্রকাশিত হইতে থাকিল। ইহা শুধু এক কবির অস্তে আর-এক কবির উদয় নয়,—ইহা বাঙ্গালা-সাহিত্যের 'প্রাচীন' যুগের অবসানে 'নব' যুগের অভ্যুত্থান। বাঙ্গালা-সাহিত্যের আলোচনায় এ কথাটি বুঝিয়া রাখা একান্তই কর্ত্তব্য। ধারাভেদে যুগভেদ হয়। প্রাচীনযুগের বাঙ্গালা-সাহিত্যের ধারা ছিল ধর্ম্মসাহিত্যের ধারা। ক্ষুদ্র কবিতাদির কথা বলিতেছি না। কাব্য বা মহাকাব্যই ধারা নির্দ্দেশ করে। অবান্তর ধারা ও অন্তর্যুগ সমেত বাঙ্গালার যে 'প্রাচীন' যুগ, তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যের (Pure Literature) একান্ত অভাব ছিল। এমন কি, ভারতচন্দ্রের Romantic কাব্য 'বিদ্যাসুন্দর'ও ধর্ম্মের সহিত বিজড়িত ও দেবী-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে উহা সমাপ্ত। এই ভারতচন্দ্রীয় যুগ বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রাচীন যুগের শেষ অন্তর্যুগ, এবং দাশরথি রায় ও ঈশ্বরগুপ্ত এই যুগের শেষ কবি। সংস্কৃতে নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যের অভাব নাই। কিন্তু বাঙ্গালায় উহা ছিল না বলিলেই হয়। মধুসূদনের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে সংস্কৃত কয়েকখানি নাটকের অনুবাদ হইতে তাৎকালিক শিক্ষিত সম্প্রদায় ঐ-জাতীয় সাহিত্যের আস্বাদ গ্রহণ করিতেছিলেন। তখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় মৌলিকভাবে নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই। এই 'তিলোত্তমা-সম্ভব' কাব্যই বাঙ্গালায় মৌলিক আকারে নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যের প্রথম প্রকাশ। শুধু ইহাতেই "নবযুগ" সূচিত হইতে পারিত। কিন্তু এই সঙ্গে আরও একটী বিশিষ্ট ধারাভেদ মিলিত হইয়া এই নবযুগের সাহিত্যকে সর্ব্বাংশে এক নূতন পথে চালিত করিয়াছে। আমি এখানে পাশ্চাত্য প্রভাবের ইঙ্গিত করিতেছি। এই প্রভাবই এই নবযুগের বঙ্গ-সাহিত্যকে সম্পূর্ণ এক নূতন ধরণের বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে বাঙ্গালা-সাহিত্যে এই প্রভাব দিন-দিন প্রবল হইতে প্রবলতর রূপ ধারণ করিতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন ও নবযুগের এইখানেই বিশিষ্ট প্রভেদ

এবং মধুসূদনই ইহার প্রবর্ত্তক। তাঁহার 'তিলোত্তমা-সম্ভব'-কাব্যই ঐ বৈশিষ্ট্যে সর্ব্বাংশে এক নূতন আকার ধারণ করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যে নবযুগের অবতারণা করিল। প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্যের অপূর্ব্ব সম্মিলনে বাঙ্গালায় ইহা নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যের প্রথম কাব্য।

মধুসূদন যেমন পাশ্চাত্য পুরাণ ও কাব্যাদির রসগ্রাহী ছিলেন, তেমনই প্রাচ্য পুরাণ ও কাব্যাদির প্রতিও তাঁহার অনুরাগ কম ছিল না। পাশ্চাত্যের মধ্যে গ্রীক্-প্রভাব তাঁহার উপর বড়ই প্রবল ছিল। কথিত আছে, তাঁহার কোন বন্ধুকে তিনি এক সময়ে বলিয়াছিলেন—"My writings are three-fourths Greek." তাহা হইলেও, শর্ম্মিষ্ঠাদি তাঁহার প্রথমকার রচনাগুলিতে প্রাচ্য-প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশী। 'পদ্মাবতী'তে গ্রীক-পুরাণের আখ্যানবস্তু ছদ্মবেশে থাকিলেও, তাহাতেও প্রাচ্য-প্রভাব কম নয়। তারপর, তিলোত্তমা-সম্ভবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রভাবই সম্মিলিতরূপে বিদ্যমান। ইহার আখ্যানবস্তু মহাভারত হইতে গৃহীত; কিন্তু পরিকল্পনায় কুমারসম্ভবের সহিত গ্রীক্ প্রভাব মিশ্রিত। বিষয়-সাদৃশ্যহেতু কুমারসম্ভবের সহিত তিলোত্তমা-সম্ভবের ঘনিষ্ঠতা না থাকিয়াই পারে না। ইহার নামকরণটী পর্য্যন্ত কুমারসম্ভবের অনুকরণে। লাঞ্ছিত দেবগণে, ব্রহ্মা-স্তবে, বসন্ত-বর্ণনে কুমারসম্ভবের সুস্পষ্ট ছায়া। তাহা ছাড়া, ভাবাংশে কোথাও রঘুবংশকে স্মরণ করাইয়া দেয়, কোথাও বা মেঘদূতকে। পক্ষান্তরে, ধবলাচলে চিন্তাকুল দেবেন্দ্রের সেবার্থ তথায় রজনীদেবী, নিদ্রাদেবী, ও স্বপ্নদেবীর আগমন, শচীকে আনিবার জন্য স্বপ্নদেবীর গমন, বিশ্বকর্ম্মাকে আনিবার জন্য পবনের দৌত্য—এ সব গ্রীক্-পুরাণের আদর্শে। গ্রীক্-পুরাণের দেবদূত 'Mercury' তিলোত্তমা-সম্ভবে আশুগতি পবন এবং Vulcan এ কাব্যের বিশ্বকর্ম্মা। ছন্দঃ ও ওজোগুণাত্মক ভাষা ইংলণ্ডীয় মহাকবি মিল্টনের মহাকাব্যের (Paradise Lost) আদর্শে। লাঞ্ছিত দেবগণের মন্ত্রণা-সভাও ঐ কাব্যের ছায়ায় কল্পিত এবং দৈত্য-কাননে বিচরণশীলা তিলোত্তমা মিল্টনের Eve কে স্মরণ করাইয়া দেয়। কাব্যের আরম্ভ-ভাগে ধবলাচলের বর্ণনা গাম্ভীর্য্যে কবি Keats এর 'Hyperion' এর

আরম্ভ-ভাগের সদৃশ। এইরূপে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের গাঢ় সম্মিলনে এই কাব্যখানি রচিত।

বাঙ্গালা-সাহিত্যে এই সম্মিলনই ছিল মধুসূদনের সাহিত্য-সাধনায় একান্ত অভীপ্সিত কার্য্য, এবং এই কার্য্য সাধনের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইয়া প্রাণপণ করিয়াছিলেন—"শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্য্যং বা সাধয়েয়ম্"—হয় শরীর পাতন, নয় কার্য্য-সাধন। সেকালে তাঁহার গ্রন্থগুলির প্রচ্ছদপত্রে যে একটী সাঙ্কেতিক চিত্র থাকিত, তাহা ঐ সাধনারই দ্যোতক। একদিকে হস্তী, অপর দিকে সিংহ,—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সঙ্কেত। এই উভয়ের মধ্যস্থ কাব্যপ্রতিভারূপী সূর্য্য বঙ্গ-সাহিত্য-শতদলকে সমুদ্ভাসিত করিতেছে। মধুসূদনের সৌভাগ্য যে, তিনি বঙ্গ-সরস্বতীর কৃপায় তাঁহার সঙ্কল্পিত কার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন।

তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্য প্রাচ্য-প্রতীচ্য-সম্মিলনের পতাকাধারী হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যে নবযুগের অগ্রদূত-রূপে বিরাজমান এবং এই গৌরবে উহা চিরদিন গরীয়ান্ হইয়া থাকিবে। তিলোত্তমাসম্ভব না হইলে মেঘনাদবধ ও বীরাঙ্গনার সম্ভাবনা থাকিত না,—নবযুগের সাহিত্যালোচনায় এ কথা স্মরণ রাখা চাই।

ব্রজাঙ্গনা-কাব্য

তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্যের প্রথম সর্গে দেবেন্দ্র-রমণী সম্বন্ধে একস্থলে আছে,—

"——— ——— বিরহবিধুরা,
ভ্রান্তি দূতী সহ সতী ভ্রমেণ জগতে।"

এইখানে পদাঙ্কদূতের * পদাঙ্ক সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়;—

"গোপী ভর্ত্তু বিরহবিধুরা কাচিদিন্দীবরাক্ষী
উন্মত্তেব স্খলিতকবরী নিঃশ্বসন্তী বিশালম্।
অত্রৈবাস্তে মুররিপুরিতি ভ্রান্তিদূতী সহায়া
ত্যক্ত্বা গেহং ঝটিতি যমুনামঞ্জুকুঞ্জং জগাম।"

পদাঙ্কদূতের এই "বিরহবিধুরা" "ভ্রান্তিদূতী-সহায়া", "উন্মত্তেব গোপী"ই হইল ব্রজাঙ্গনা-কাব্যের বীজ এবং এই বীজ কবির মনঃক্ষেত্রে উপ্ত হইয়াছিল সম্ভবতঃ তিলোত্তমা-সম্ভব রচনার পূর্ব্বেই। মধুসূদন তিলোত্তমা রচনা শেষ করিয়া, জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" ও বিদ্যাপতির "পদাবলী" আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার বন্ধুবর ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে বলিলেন—"মধু, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনী শোনাতে পার?" মধুসূদন যাহা লিখিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিতেছিলেন, হঠাৎ ভূদেবের মুখ হইতে ঠিক তাহারই ইঙ্গিত পাইয়া, তিনি অধিকতর আগ্রহে তাঁহার স্বাভাবিক ক্ষিপ্র হস্তে অল্প সময়ের মধ্যে ব্রজাঙ্গনা-নামক এই গীতি-কাব্য খানি

*পদাঙ্কদূতম্—পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম ইঁহার রচয়িতা। ইঁহার আদি নিবাস শান্তিপুরে ছিল। পরে ইনি নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া সেইখানেই বাস করিতেন। ৬৪৫ শকাব্দে এই কাব্যখানি রচিত হয়।

রচনা করিলেন। এই সময়ে একদিন তাঁহার পরিচিত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত নামক জনৈক ভদ্রলোক কবির মুখে পাণ্ডুলিপির কিছু-কিছু আবৃত্তি শুনিয়া মুগ্ধ হইলে, উদার-স্বভাব মধুসূদন তৎক্ষণাৎ এই কাব্যের স্বত্বাধিকার প্রদান করিয়া ছাপিবার জন্য পাণ্ডুলিপিখানি ঐ ভদ্রলোকের হস্তে প্রদান করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ২৪শে এপ্রিল তারিখে মধুসূদনের লিখিত এক পত্র হইতে জানা যায় যে, তিনি ব্রজাঙ্গনা রচনা শেষ করিয়া এবং ছাপিতে দিয়া, পরে মেঘনাদবধ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন।—

"I enclose the opening invocation of my মেঘনাদ. You must tell me what you think of it. A friend here a good judge of poetry has pronounced it magnificent. By the bye I have a small volume of odes in the press. They are all about poor old রাধা and her বিরহ।"

উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মধুসূদন মেঘনাদ-বধ ও ব্রজাঙ্গনা "এক সঙ্গে রচনা" করেন নাই।*

এই গীতিকাব্যখানি মধুসূদনের প্রথম গীতিকাব্য ; এবং দুঃখের বিষয় যে, উহাই তাঁহার শেষ গীতিকাব্য—ইচ্ছা থাকিলেও মনশ্চাঞ্চল্যে তিনি আর গীতিকাব্য লিখিতে পারেন নাই। তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্যে যিনি বঙ্গ-সাহিত্যে অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন এবং মেঘনাদবধ-কাব্যে ঐ ছন্দের যথেষ্ট পরিপুষ্টি সাধন করিলেন, তাঁহারই লেখনী হইতে, ঐ দুইখানির কাব্য রচনার মধ্যে সুমধুর মিত্রাক্ষরের এই গীতি-কাব্যখানি

* "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত" লেখক মহাশয়ের উক্তি—"মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনা এক সঙ্গে রচনা" ভ্রান্তিমূলক। ব্রজাঙ্গনা কাব্যখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, উহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতে অত্যধিক বিলম্ব হইয়াছিল—এমন কি, মেঘনাদবধ-কাব্যের প্রথম ভাগ (পঞ্চম সর্গ পর্য্যন্ত) মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার পরে, উহার দ্বিতীয় ভাগের শেষ সর্গ যখন ছাপা হইতেছিল, এমন সময়ে ব্রজাঙ্গনা মুদ্রাযন্ত্রের কবল হইতে বাহির হয়। (ঐ জীবন চরিতের ৩য় সংস্করণের ৪৩ সংখ্যক পত্র দেখ)। বোধ হয়, এইজন্যই ব্রজাঙ্গনা রচনার কাল-সম্বন্ধে কবির জীবনচরিতকার মহাশয়ের ভ্রান্তি ঘটিয়াছে।

রচিত হইতে দেখিয়া তাৎকালিক সাহিত্য-সমাজ বাস্তবিকই চমকিত হইয়াছিলেন। শুধু চমকিত নহে,—বহু দিনের পরে এই ক্ষুদ্র গীতিকাব্যখানিতে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর মজ্জাগত রসের আস্বাদন পাইয়া তাঁহারা মুগ্ধও হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রেমাশ্রুতে সিক্ত এই বাঙ্গালা দেশে রাধাভাব বাঙ্গালীর মজ্জাগত। বৈষ্ণব-যুগের পরে বহুকাল ধরিয়া আর কোন কবি রাধাভাবের এমন করুণ চিত্র বাঙ্গালীর সম্মুখে ধরেন নাই। মধুসূদনের নিকট হইতে এ যে একেবারে অপ্রত্যাশিত দান—আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, ইহা মাধুর্য্যে মহান্!

মধুসূদন বৈষ্ণব-পদাবলীর আলোচনা-কালে-দেখিয়াছেন যে, তাহাতে কৃষ্ণবিরহে রাধিকার উন্মাদাবস্থা পরোক্ষভাবে সখীদের মুখে বর্ণিত হইলেও, সাক্ষাৎ-ভাবে উন্মাদিনী রাধিকার চিত্র কোথাও নাই। তাই তিনি পদাঙ্কদূতের বিরহবিধুরা, ভ্রান্তিদূতী-সহায়া, উন্মত্তা গোপীকে উপাদেয় উপাদানবস্তু স্বরূপে গ্রহণ করিয়া, আগাগোড়া রাধিকার ভূমিকায় এই গীতিকাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। কবি এই কাব্যে উদ্‌ভ্রান্তা রাধিকাকে ব্রজের পূর্ব্বস্মৃতির যত কিছু স্থান, সেই সব স্থানে ঘুরাইয়াছেন। সর্ব্বত্রই রাধিকার পূর্ব্বস্মৃতির hallucination এবং কৃষ্ণ-সেবিত সকল স্থলেই রাধিকার অপূর্ব্ব কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি ও ঐকান্তিক তন্ময়তা। বৈষ্ণব গ্রন্থে উদ্ধবের মুখে বিরহোন্মত্তা রাধিকার বর্ণনায় একটি লক্ষণ উক্ত হইয়াছে—"প্রথয়তি তব বার্ত্তাং চেতনা-চেতনেষু"। এ কাব্যে কবি সর্ব্বত্রই রাধিকার ঐরূপ ব্যবহার দেখাইয়াছেন—চেতনাচেতন নির্ব্বিশেষে সকলের কাছেই রাধিকার বিরহ ব্যথা জ্ঞাপন ও কৃষ্ণান্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছেন।

প্রথমেই, "বংশীধ্বনি";—(ইহা কি বন্ধুবর ভূদেবের অনুরোধ স্মরণে?)—ব্রজে কৃষ্ণ নাই, তথাপি রাধিকার উদ্‌ভ্রান্ত কর্ণে বংশীধ্বনি হইতেছে;—

"নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে বাঁশরী রে" ইত্যাদি।

এই 'নাচিছে' পূর্ব্বস্মৃতি হইতে পারে না, ইহা উদ্‌ভ্রান্ত শ্রবণ। তখন বৃন্দাবনে কৃষ্ণই নাই, বংশীধ্বনি হইবে কিরূপে? কিন্তু বিরহোন্মাদিনী রাধিকা সর্ব্বত্রই বংশীধ্বনি শুনিতেছেন; নতুবা তিনি

"চল সখি, ত্বরা করি,
দেখিগে প্রাণের হরি ;"

বলিবেন কেন? যেখানে যাহা নাই, সেখানে তাহাই দেখা বা শ্রবণ করা বা অনুভব করা, ইহাই হইল একপ্রকার উন্মাদের (hallucination) লক্ষণ।

এই ঘোর বিরহের দিনে সখীর ফুল তুলিবার বা ফুলমালা গাঁথিবার কথাই নয়, তবু উদ্‌ভ্রান্তা রাধিকা তাঁহার ভ্রান্ত দৃষ্টিতে পূর্ব্বস্মৃতির ফুলরাশি দেখিয়া সখীকে অনুযোগ করিতেছেন ;—

"কেন এত ফুল তুলিলি স্বজনি,
(যতন করিয়া), ভরিয়ে ডালা ?
মেঘাবৃত হলে, (কহ লো স্বজনি,)
পরে কি রজনী, তারার মালা ?
আর কি পরিব কভু ফুলহার ?
কেন লো হরিলি ভূষণ লতার ?
অলি বঁধু তার কে আছে আমার ?—
হতভাগিনী ব্রজের বালা।
হায় লো দোলাবি মালা কার গলে ?
আর কি সে নাচে তমালের তলে ?
প্রেমের পিঞ্জর, ভাঙ্গি পিকবর;
উড়ে গেছে, মোরে করে শোকাকুলা !
কবি মধুভণে, শুন ব্রজাঙ্গনে,
পাবে লো রমণে, রবে না জ্বালা।"

গানটি অতি শীঘ্র মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত বড়ই লোক-প্রিয় ছিল। এখন আর ঐ গানটী কাহারও মুখে শুনিতে পাই না; তাই এখানে গানটী লিপিবদ্ধ করিলাম।

ফুল তোলা দূরে থাক্, সখীরা রাধিকার অবস্থা দেখিয়া সম্ভবতঃ অবাক্ হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছে, এইরূপ অনুমান করাই সঙ্গত। পরে তাহাও পাওয়া যাইবে।

কৃষ্ণচূড়া-ফুল দেখিয়া রোষভরে রাধিকা ধরণীকে যেরূপ অনুযোগ করিতেছেন, তাহা সহজ অবস্থার ব্যবহার নহে, তাহা উন্মাদিনীর রোষোক্তি।

"রাগে তারে গালি দিয়া
লয়েছি আমি কাড়িয়া
মোর কৃষ্ণচূড়া কেন পরিবে ধরণী" ?

গোধূলি-কালে গোকুলের গাভীকুল গোষ্ঠে ফিরিতেছে, অথচ "রাখাল-চূড়ামণি" নাই দেখিয়া পাগলিনীর বিষাদ ;—

"আইল গোধূলি, কোথা রহিল মাধব !"

কৃষ্ণ যে গোকুলেই নাই রাধিকার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে এ কথা স্মরণ হইতেছে না !

যখন কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন বসন্তাগমে তিনি বন-বিহার করিতেন এবং সখীগণ সঙ্গে রাধিকাও তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। আজ সেই পূর্ব্বাবস্থা স্মরণে উদ্‌ভ্রান্তা রাধিকার মনে সেই ভাবের উদয় হইতেছে। নতুবা এই নিদারুণ কৃষ্ণ-বিরহে ব্রজে বসন্তাগমের সম্ভাবনা কোথায় ? কিন্তু রাধিকার উদ্‌ভ্রান্ত চক্ষু দেখিতেছে বসন্তের সুষমা, উদ্‌ভ্রান্ত কর্ণ শুনিতেছে ভ্রমর গুঞ্জন ও পিক কাকলী ! তাই রাধিকা সখীগণকে বলিতেছেন—চল যাই ;—

"আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব।"

* * *

"কি সুখ লভিব, সখি, দেখ ভাবি মনে,
পাই যদি হেন স্থলে গোকুল-রতনে।"

সখীরা কিন্তু দেখিতেছে ও বুঝিতেছে যে এ সকলই রাধিকার বিরহ-বিকার।

তাই তাহারা নীরবে অশ্রুপাত করিতেছে,—রাধিকার সঙ্গে যাওয়া ত দূরের কথা।
কিন্তু রাধিকা সখীদের মনোভাব বুঝিতেছেন না, তাই অনুযোগ করিতেছেন ;—

"কেন এ বিলম্ব আজি, কহ ওলো সহচরি,
করি এ মিনতি ?
কেন অধোমুখে কাঁদ. আবরি বদন চাঁদ,
কহ রূপবতি ?
সদা মোর সুখে সুখী, তুমি, ওলো বিধুমুখি,
আজি লো এ রীতি তব কিসেব কারণে ?
কে বিলম্বে হেন কালে ? চল কুঞ্জবনে।"

উদ্‌ভ্রান্তা বাধিকা আরও বলিতেছেন—ঐ দেখ কুঞ্জবনে পূজার উৎসব—ধরণী কুসুমাঞ্জলি দিয়া ঋতুরাজের পূজা করিতেছে, পবিমলেব ধূপগন্ধে বনস্থল আমোদিত, আর ওই শুন পিককুলের মঙ্গল-গান। নিকুঞ্জ-বিগাবী শ্যাম নিশ্চয়ই সেখানে আছেন। চল, আমরা সেখানে গিয়া শ্যাম রাজের পূজা করি ,—

"চল লো, নিকুঞ্জে, পূজি শ্যামরাজে, স্বজনি।
পাদ্যরূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে
দুই কর-কোকনদে, পূজিব রাজীব-পদে,
শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে, ভাবিয়া মনে।
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-ধ্বনি বাজিবে লো সঘনে।"

এবং পূজা শেষে—

"চির-প্রেম বর মাগি ল'ব ও গো ললনে ,"

কবি এইখানে উন্মাদিনীর মানসিক শ্যামপূজান্তে তাহার মুখ দিয়া যে "চির প্রেম-বর" মাগিবার কামনা জানাইয়া কাব্যখানি শেষ করিয়াছেন, উহাতে পাঠকের হৃদয়ে চির-বিরহী মানবের চিরন্তন কামনার করুণ সুরটি অনুরণিত হইয়া উঠে।

এই কাব্যে ব্রজের কৃষ্ণবিরহ যেন বিরহোন্মাদিনী রাধিকার মূর্ত্তি ধরিয়া বক্ষের

চারিদিকে হাহাকার করিয়া বেড়াইয়াছে,—কোথাও কৃষ্ণ আছেন ভাবিয়া, কোথাও কৃষ্ণ আসিতে পারেন ভাবিয়াও, কোথা বা কৃষ্ণ থাকিতেন ভাবিয়া —সকল স্থলেই উন্মাদিনীর কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি—কোথাও মননে, কোথাও স্মরণে, কোথাও বা অন্বেষণে!

কাব্যখানির ভাষাও বেশ বিষয়োপযোগী ও গীতিকবিতারই উপযুক্ত। ছন্দও স্বাধীন মিত্রাক্ষর—বাঁধাবাঁধি পয়ার, ত্রিপদী বা চতুষ্পদী নহে;—ভাষা ও ছন্দ যেন ভাবোচ্ছ্বাসের সহিত তরঙ্গায়িত হইয়া চলিয়াছে। উপমা-রূপকাদি অলঙ্কার সংস্কৃতের আদর্শে। মধুসূদনের এই গীতিকাব্যখানিতে, কি আদর্শে, কি ভাবে বা ভঙ্গিতে কোন অংশেই পাশ্চাত্য প্রভাবের চিহ্ন লক্ষিত হয় না। মধুসূদন এই ক্ষুদ্র গীতিকাব্যখানিতে বাঙ্গালীর প্রাণ দিয়া বাঙ্গালীর মজ্জাগত রাধাভাবের একটা সুন্দর অভিব্যক্তি দিয়াছেন।

মধুসূদন রাধা-ভাবের রস-মূর্ত্তির সন্ধান পাইয়াছেন জয়দেব ও বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে। কিন্তু তাঁহাদের রাধিকার ভোগ-লালসার প্রাচুর্য্য দেখিয়া তিনি এই কাব্যে ভোগ-লালসার অতীত দিব্যোন্মাদের যে অনাবিল রসমূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা—বৈষ্ণবাদর্শ অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নয়। মধুসূদনের প্রাণে বৈষ্ণব-ভাব থাকিলেও, তিনি সাধক-বৈষ্ণব ছিলেন না, ইহা নিশ্চিত। শুধু কাব্য-প্রতিভা-বলে কাব্যাংশে সাধক-কবির কতখানি সমকক্ষ হইতে পারা যায়, এই ব্রজাঙ্গনা-কাব্যখানি তাহার চমৎকার নিদর্শন। তবে, চণ্ডীদাসের সহিত মধুসূদনের তুলনাই হইতে পারে না, ব্রজাঙ্গনা-প্রসঙ্গে নব্য-বৈষ্ণবপন্থী কেহ-কেহ একথা ভাবিয়া দেখেন না। বৈষ্ণব-কবিদিগের মধ্যে চণ্ডীদাস আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয়ভাবাবিষ্ট (আধুনিক ভাষায় "মিষ্টীক্") কবি। কিন্তু মধুসূদন জয়দেব-বিদ্যাপতি-প্রমুখ বৈষ্ণব-কবিদিগের ন্যায় প্রধানতঃ বস্তুতন্ত্রের—রূপরসাদির কবি। চণ্ডীদাস রূপরসাদি স্পর্শ করেন না, এমন নয়; কিন্তু রূপ-রসাদির মধ্যে তিনি অবস্থান করেন না। রূপ-রসাদি স্পর্শ-মাত্র করিয়া তিনি অতীন্দ্রিয় ভাব-রাজ্যে উঠিয়া পড়েন। তাঁহার যত-কিছু ভাব-লীলা, কবিত্ব-

সৌন্দর্য্য, সে সবই ভাব-জগতে। মধুসূদন এই শ্রেণীর কবি নহেন। জয়দেব বিদ্যাপতির ন্যায়, রূপরসাদির রাজ্যই মধুসূদনের কবিত্ব-ক্ষেত্র এবং তাঁহার যত-কিছু কবিতা-মাধুরী, তাহা রূপ-রসাদির ক্ষেত্রেই মুঞ্জরিত। যদি কোন বৈষ্ণব-কবির সহিত মধুসূদনের তুলনাই করিতে হয়, তবে বিদ্যাপতির সঙ্গে তুলনা করা চলে এবং সে তুলনায় মধুসূদনকে কোন অংশেই হীন বলা চলে না। বরং জয়দেবের ন্যায় বিদ্যাপতির অনেক স্থলে যে-ভোগলালসার আধিক্য লক্ষিত হয়, মধুসূদনের এই দিব্যোন্মাদিনী রাধিকার অবস্থা-গুণে তাহার অবসরাভাব। বৈষ্ণব-তত্ত্বে রাধিকার এই দিব্যোন্মাদ তন্ময়তার চরম পরিণতির পরিচায়ক। তাই উহা রাধাভাবের একটি উচ্চ স্তর বলিয়া পরিগণিত। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনার রাধিকার আদর্শ এই স্তরের। তাঁহার এক পত্র হইতে ইহার একটু ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। পত্রখানিতে তিনি তাঁহার স্বাভাবিক রসিকতার ভঙ্গিতে বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখিতেছেন ;—

"—Mrs Radha is not such a bad woman after all If she had a "Bard" like your humble servant from the beginning, she would have been a very different character. It is the vile imagination of poetasters that has painted her in such colours."

বৈষ্ণব-কবিদিগের পদাবলীর বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাতে মাধুর্য্য-ভাবাত্মক লীলারস পরিস্ফুটনের একটা গুহ্য (Esoteric) দিক্ ও ভাব আছে—যাহা সাধক-বৈষ্ণব ভিন্ন অপরের অধিগম্য নহে। মধুসূদন কবি হইলেও "বৈষ্ণব" কবি ছিলেন না ; আর তাঁহার প্রাণে বৈষ্ণব-ভাব থাকিলেও তিনি সাধক-বৈষ্ণব ছিলেন না। কাজেই তিনি কেবলমাত্র সাহিত্যিকের চক্ষে পদাবলী-সাহিত্যের বাহ্য (Exoteric) দিক্‌টা দেখিয়াই উহার স্থল-বিশেষকে কুৎসিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পরে বঙ্কিমচন্দ্রও ঠিক ঐ কারণেই বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যকে "মদন-মহোৎসব" নাম দিয়া উহার প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছিলেন। *

* শুধু বৈষ্ণব-সাধনায় নহে সকল ধর্ম্মের সাধনারেই একটা গুহ্য দিক ও ভাব আছে।

যাহা হউক, মধুসূদন পদাবলী-সাহিত্য হইতেই রাধা-ভাবের একটা উচ্চতর স্তরের সন্ধান পাইয়াছিলেন বলিয়া, তিনি উহাতে ভোগ-লালসার প্রাচুর্য্যে ব্যথিত হইয়াছিলেন। তাই তিনি বৈষ্ণব-শাস্ত্রোক্ত তন্ময়তার পরিচায়ক দিব্যোন্মাদ-অবস্থা অবলম্বনে মহাভাবময়ীর তন্ময়-ভাবের অনাবিল একটি রসমূর্ত্তি, যতখানি তাঁহার কবিত্ব-শক্তিতে সম্ভব, তাহাই দিয়া গিয়াছেন।

বৈষ্ণব-সাধক এ কাব্যে প্রাণের পরিচয় পাইতে পারেন কি, না,—বলিতে পারি না;—কারণ, সাধকের অনুভূতি আমার নাই। তবে, সাহিত্যিক অনুভূতিতে এই কাব্যখানি যে বেশ প্রাণময় ও রসাল, তাহা এই কাব্যখানির প্রতি পাঠক-সমাজের সুদীর্ঘকালব্যাপী সমাদরই প্রকৃষ্ট রূপে সপ্রমাণ করিতেছে। এই ব্রজাঙ্গনা-কাব্যে নবযুগের ভাব ও ভাষার মধ্য দিয়া উন্মাদিনী রাধায় বৈষ্ণব-প্রেমের যে নির্ম্মল রসচিত্র আমরা পাইয়াছি, বঙ্গসাহিত্য-সৌধে তাহা চিরোজ্জ্বল-ভাবে বিরাজমান থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া, বঙ্গ-সাহিত্যের নবযুগের প্রারম্ভে বৈষ্ণব-সাহিত্যের মাধুর্য্য ভাবাত্মক এই গীতিকাব্যখানি যদি নব শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মনে আদর্শ-রাধাভাবের উন্মেষ-কল্পে কিছুমাত্র সাহায্য করিয়া থাকে;—যদি পাশ্চাত্যমুখ নব্য বাঙ্গালীকে তাহার নিজস্ব ধন বৈষ্ণবাদর্শের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে শিখাইয়া থাকে, তাহা হইলেও এই ক্ষুদ্র গীতিকাব্যখানি রচনা করিয়া মধুসূদন ধন্য হইয়াছেন, বলিতে হইবে।

বৈষ্ণব-সাধকের কাছে পদাবলী-সাহিত্য কেবলমাত্র সাহিত্য ও কবিত্ব নহে, উহা তাঁহার সাধনার (Emotional realisation-এর) সহায়। শ্রীচৈতন্য রামানন্দাদি অন্তরঙ্গ-সাধকের সহিত নিভৃতে জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির পদাবলীর রস পরমানন্দে আস্বাদন ও উপভোগ করিতেন। সুতরাং এরূপ সাহিত্যের কেবলমাত্র বাহ্য দিক দেখিয়া ও বাহ্য ভাব লইয়া নিন্দা করা সাহিত্য-সমালোচকের পক্ষে সমীচীন নহে। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কি, তাহার নিগূঢ় সাধনাই বা কিরূপ এবং সেই সাধনায় পদাবলী-সাহিত্যই বা কতটা সহায় এ সব গোড়ার কথা আলোচনা করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

বীরাঙ্গনা-কাব্য

মেঘনাদবধ-কাব্যের দ্বিতীয় ভাগ (ষষ্ঠ হইতে নবম সর্গ পর্য্যন্ত) রচনা শেষ করিয়া মধুসূদন "সিংহল-বিজয়" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু, কি জানি কেন, কয়েক ছত্র মাত্র লিখিয়াই তাহা ফেলিয়া রাখিয়া, বীরাঙ্গনা-নামক একখানি পত্রিকা-কাব্য কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই লিখিয়া ফেলেন। তাঁহার ঐ সময়ে লিখিত পত্রে আছে—

"I have only written 20 or 30 lines of the new Epic. In fact, I have laid it by for a time only, I hope. But within the last few weeks I have been scribbling the thing to be called বীরাঙ্গনা i.e. Heroic Epistles from the most noted Puranic women to their lovers or lords. There are to be 21 Epistles and I have finished eleven. These are being printed off, for I have no time to finish the remainder."

সঙ্কল্পিত ২১ খানি পত্রিকার ১১ খানি বীরাঙ্গনা-কাব্য নামে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগে প্রকাশিত হয়।* বাকি পত্রিকাগুলির মধ্যে মধুসূদন কয়েকখানি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ সময়ে ইউরোপ-যাত্রার চিন্তায় তাঁহার মনশ্চাঞ্চল্য ঘটায় কোন পত্রিকাই শেষ করিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য যে, আরব্ধ 'সিংহল-বিজয়' কাব্যের ২০।৩০ পংক্তি, যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার পর আর ইহাতেও হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই।

---

* ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে-প্রথম অমিত্রচ্ছন্দের সৌন্দর্য্য ধরিতে পারেন নাই। পরে, তিনি ইংরাজীতে অমিত্রচ্ছন্দ আবৃত্তি আয়ত্ত করিয়া ক্রমে বাঙ্গালা কাব্যে ঐ ছন্দ প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। তাই, মধুসূদন অমিত্রচ্ছন্দের এই শেষ কাব্যখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করিয়া মঙ্গলাচরণস্থলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ রোমক কবি ওভিদের (Ovidius) Heroic Epistles-নামক পত্রিকা-কাব্য পড়িয়া বঙ্গ ভাষায় ঐরূপ সাহিত্যের প্রচলনের প্রয়াসী হইয়া মধুসূদন "বীরাঙ্গনা"-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। ওভিদের ন্যায় ২১ খানি পত্রিকাই লিখিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। কিন্তু অর্থাভাবে তিনি ১১ খানি পত্রিকা লিখিয়া ছাপিতে দিয়াছিলেন। তখন তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, প্রথম ভাগ বীরাঙ্গনা-কাব্যখানির বিক্রয়-লব্ধ অর্থে দ্বিতীয় ভাগ ছাপাইবার সুবিধা হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই ঘটনাচক্র অন্য রূপে পরিবর্ত্তিত হইল। মনশ্চাঞ্চল্যে তিনি আর বাকি পত্রিকাগুলি লিখিতেই পারেন নাই। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখের তাঁহার স্মারক লিপিতে ছিল—

"It is my intention, God willing, to finish this poem (বীরাঙ্গনা কাব্য) in XXI Books. But I must print the XI already finished. The proceeds of the sale of the 1st part must defray the expenses of printing the second. "Born an age too soon"—A time will come when these works of mine will fill the pockets of printers, book-sellers, *et hocgenus omne*, and now I am obliged to 'shell out"

ওভিদ্-নামক রোমক কবির Heroic Epistles পাশ্চাত্যপুরাণে সুপরিচিত নায়িকাগণ কর্ত্তৃক তাহাদের পতি বা প্রণয়ীদের প্রতি লিখিত পত্রিকা-কাব্য। ইহা পড়িয়াই, মধুসূদন আমাদের পুরাণ অবলম্বনে বঙ্গসাহিত্যে একখানি পত্রিকা কাব্য রচনা করিতে ইচ্ছা করেন। তাহারই ফল "বীরাঙ্গনা-কাব্য।" ইহা ভিন্ন, এই পত্রিকাগুলি রচনায় মধুসূদন আর কোন রূপেই ওভিদের নিকট ঋণী নহেন।

কোন-কোন সমালোচক এই "বীরাঙ্গনা" শব্দটির সাধারণ অর্থ (বীরের অঙ্গনা বা বীরা অঙ্গনা) বুঝিয়া কোন-কোন পত্রিকার অসঙ্গতিতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। ফলতঃ বীরাঙ্গনার অর্থ কবি নিজে যাহা দিয়াছেন, তাহা মানিয়া লইলে, আর কোন গোল থাকে না। "বীরাঙ্গনা" *i e* Heroic Epistles from the most

noted Puranic women to their lovers or lords." পরে চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর আরম্ভে আত্ম-পরিচয়ে কবি লিখিয়াছেন—

—"বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী
যার, বীরজায়া-পক্ষে বীরপতিগ্রামে।"

এখানেও বুঝিতে হইবে যে, কবি "বীর" শব্দ 'পৌরাণিক নায়ক-নায়িকা' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। * 'বীর' শব্দের সাধারণ অর্থ ধরিতে গেলে, অনেকগুলি পত্রিকার বিষয়ের সহিত "বীর" নামের সঙ্গতি থাকে না।

সংস্কৃত-সাহিত্যে স্থল-বিশেষে নারী কর্ত্তৃক পতি বা প্রণয়-পাত্রকে পত্র লিখনের উল্লেখ পাওয়া যায়। কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল-নাটকে বিরহবিধুরা শকুন্তলা কর্ত্তৃক পত্র লেখার উল্লেখ আছে। ভাগবতে রুক্মিণীদেবী শ্রুতনামা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপূর্ব্ব পূর্ব্বরাগের ভাবে পত্র লিখিয়া এক ব্রাহ্মণের দ্বারা উহা দ্বারকানাথের কাছে প্রেরণ করিয়াছেন। সংস্কৃত-সাহিত্যের নানাস্থানে নারীজন-কর্ত্তৃক প্রণয়-পাত্রকে পত্র লেখার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাই সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র সাহিত্য-দর্পণে দেখা যায়—"লেখ্যপ্রস্থাপনৈঃ নার্য্যা ভাবাভিব্যক্তিরিষ্যতে।" মধুসূদনও তাঁহার এই কাব্যের প্রচ্ছদ-পত্রে ঐ শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়া এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন। সংস্কৃত-সাহিত্যে এরূপ পত্রের উল্লেখ থাকিলেও, কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, এমন পত্রিকা নাই বলিলেই হয়। তাই, ওভিদের পত্রিকাগুলি পড়িয়া কবি বাঙ্গালায় ঐরূপ কয়েকখানি পত্রিকা—যাহা পত্রিকা-কাব্য বলিয়া অভিহিত হইতে পারে, এমন কতকগুলি পত্রিকা লিখিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যের দুর্ভাগ্যে এগারখানির বেশী রচনা করিতে পারেন নাই। আমাদের পুরাণ-প্রসিদ্ধ ১১ জন নারী নির্ব্বাচন করিয়া, যাঁহার উপাখ্যানের যে অংশে পত্র-লিখন কাব্যাংশে সঙ্গত ও শোভন, কবি সেই অংশ অবলম্বন করিয়া পত্রিকাগুলি রচনা করিয়াছেন।

---

* পাশ্চাত্য সাহিত্যের কাব্য-নাটকাদিতে, পৌরাণিক উপাখ্যানে, প্রধান নায়ক-নায়িকা যথাক্রমে Hero ও Heroine বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে এই বীরাঙ্গনাই তাঁহার তৃতীয় ও শেষ কাব্য। তিলোত্তমা-সম্ভব প্রথম, মেঘনাদবধ দ্বিতীয়, অবশেষে এই বীরাঙ্গনা। তিনখানি কাব্যের ভাষা ও ছন্দ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই বলা যাইতে পারে যে, কোন্‌খানির পর কোন্‌খানি রচিত। তিলোত্তমাসম্ভবে ঐ ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তন,—ভাষা কর্কশ ও জড়তাময় এবং ছন্দ আড়ষ্ট। মেঘনাদবধ-প্রথমভাগের রচনায় ঐ সব দোষ অধিক না থাকিলেও স্থলে-স্থলে ছিল, এবং উহার দ্বিতীয় সংস্করণের সময় সেই সব স্থলের সংস্কার করিতে হইয়াছিল। ঐ কাব্যের দ্বিতীয়-ভাগ রচনায় দেখা যায় যে, ছন্দ ও ভাষা সুস্পষ্টরূপে কবির করায়ত্ত হইয়াছে। অবশেষে বীরাঙ্গনা-কাব্যের রচনায় দেখা যায় যে, কাব্যের ভাষা ও ছন্দ যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে হয়, তাহাই হইয়াছে—কোথাও কর্কশতার লেশ মাত্র নাই, ভাষা সুললিত ও সরল এবং ছন্দ সর্ব্বত্রই মধুর ও সঙ্গীতস্বাদ-বিশিষ্ট। অবশ্য, বিষয়-গুণে ভাষার লালিত্যের তারতম্য হইয়া থাকে। তাই দেখা যায় যে, তিলোত্তমাসম্ভবে, তিলোত্তমার সৃষ্টি ও তৎপরবর্ত্তী ঘটনা-বর্ণনার ভাষা পূর্ব্ববর্ত্তী সর্গগুলির ভাষা অপেক্ষা অধিকতর সুমধুর। মেঘনাদবধ-কাব্যেব চতুর্থ সর্গে বর্ণিত সীতা ও সরমার কথোপকথন সরল, সুললিত ও সুমধুর ভাষার দৃষ্টান্ত। অবশেষে বীরাঙ্গনার রচনা ভাষা, ও ছন্দ-পরিপাট্যে অমিত্রচ্ছন্দের আদর্শ বলিয়া পরিগণিত। তা ছাড়া, বিষয়-গুণেও পত্রিকাগুলি অতি সুমধুর হইবার কথা, এবং হইয়াছেও তাহাই।

বীরাঙ্গনার আর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, উহার পত্রিকাগুলিতে বিষয়-বৈচিত্র্য হেতু সুন্দর রস-বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়—এক-এক পত্রিকার বিষয়, ভাব ও রস এক-এক রূপ। তাই পত্রিকাগুলি পড়িতে কোথাও ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। প্রত্যেক পত্রিকাখানি নব রসে অনুপ্রাণিত ও নব-নব ভাবে পল্লবিত। এই কাব্যখানি, আকারে ক্ষুদ্র হইলেও কাব্যাংশে এমন মনোহর পত্রিকা-সাহিত্য আর কোথাও আছে কিনা, জানি না। এখন আমি একে-একে পত্রিকা-গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

শকুন্তলা-পত্রিকা

তপোবন-পালিতা সরলা বালা শকুন্তলাকে তপোবনেই বিবাহ করিয়া, রাজা দুষ্মন্ত চলিয়া গেলেন। কোথায় তিনি স্বল্পদিনের মধ্যে সমাদরে ও সমারোহে শকুন্তলাকে প্রাসাদে লইয়া যাইবেন ; না, একবারে বিস্মৃত ! মাসের পর মাস চলিয়া যাইতে লাগিল। এ অবস্থায় গর্ভবতী স্ত্রীর মনের ভাব সহজেই অনুমেয়। দুর্ব্বাসার অভিশাপের কথা প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া শকুন্তলাকে জানায় নাই। কাজেই শকুন্তলা প্রতিনিয়তই রাজার লোকজনের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। পবন-স্বনন শুনিলে বা ধূলারাশি উড়িতে দেখিলেই ভাবেন, —ঐ বুঝি রাজার লোকজন আসিতেছে ;—

> "হাদে দেখ্, সই, এতদিনে আজি
> স্মরিলা, লো, প্রাণেশ্বর এ তাঁর দাসীরে !
> ওই দেখ্, ধূলারাশি উঠিছে গগনে !
> ওই শোন্ কোলাহল ! পুরবাসী যত
> আসিছে ল'তে মোরে নাথের আদেশে।"

কিন্তু প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া মুনিব শাপেব কথা জানে। তাই তাহারা শকুন্তলার এইরূপ ভাব দেখিয়া মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না ; কিন্তু তাহাদের বুক ফাটিয়া যাইতেছে ;—

> "নীরবে ধরি.. লা কাঁদে প্রিয়ংবদা,
> কাঁদে অনসূয়া-সই বিলাপি' বিষাদে।"

শকুন্তলার এইরূপ জাগ্রত স্বপ্নে পত্রিকাখানি বড়ই হৃদয়গ্রাহী। পত্র-শেষে শকুন্তলা লিখিতেছেন যে, বনবাসী পত্রবাহক রাজপুরে প্রবেশ করিতে পারিবে কি না, রাজসভায় গিয়া রাজহস্তে পত্রখানি দিতে পারিবে কি না, জানি না—

"কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি, ধরে
তৃণে, আর কিছু যদি না পায় সম্মুখে।
জীবনের আশা, হায়, কে ত্যজে সহজে!"

এই বিরহ-লেখনখানি উপেক্ষিতা বিবাহিতা-স্ত্রীর আদর্শ প্রেম-পত্রিকা। কাব্য-জগতে শকুন্তলা যেমন অপূর্ব্ব সৃষ্টি, এই পত্রিকাখানিও তেমনি সরলা বিরহ-পীড়িতা তপোবন-বালিকার মনোভাবের মনোহর আলেখ্য!

তারা-পত্রিকা

এই পত্রিকার বিষয়টী (Subject-matter) সুরুচিসঙ্গত নয় বলিয়া উহা এ সংস্করণের অন্তর্ভূ্ত করা হইল না।

রুক্মিণী-পত্রিকা

এই পত্রিকাখানি রুক্মিণীর অপার্থিব কৃষ্ণপ্রেমের সুচারু অভিব্যক্তি। বাল্য হইতে তিনি পিতৃগৃহে সমাগত সাধুসজ্জনদিগের মুখে কৃষ্ণাবতারের কথা শুনিয়া, তাঁহাকেই মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। এখন যৌবনারম্ভে ভ্রাতা তাঁহাকে শিশুপালের পাণিগ্রহণ করাইতে প্রয়াসী! এই অবস্থায় কৃষ্ণৈক-প্রাণা রুক্মিণীর মনোভাবকে উপাদান-বস্তু করিয়া, কবি এই পত্রিকা-কাব্যে অপূর্ব্ব পূর্ব্বরাগের কাব্যচিত্রখানি রচনা করিয়াছেন। ভাগবতের রুক্মিণী-পত্রিকার সূত্র অবলম্বন করিয়া কবি নিপুণ শিল্পীর মত এই মনোজ্ঞ পত্রিকাখানি রচনা করিয়াছেন। ইহাতে রুক্মিণীর প্রেমভক্তি নানাবর্ণে সমুজ্জ্বল ও সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। রুক্মিণীর আবাল্য-সঞ্চিত কৃষ্ণপ্রেমের চিত্র বাঙ্গলা-সাহিত্যে বিরল বলিয়া এই পত্রিকাখানি বড়ই উপভোগ্য।

কেকয়ী-পত্রিকা

রামায়ণে আছে, রামের রাজ্যাভিষেকের বিপুল উদ্যোগ হইতে থাকিলে, দাসী মন্থরার পরামর্শে কেকয়ী দুর্জ্জয় অভিমানে রোষাগারে প্রবেশ করেন। কিন্তু মধুসূদন সে পন্থায় না গিয়া, কেকয়ীকে দিয়া দশরথের প্রতি এই পত্রিকাখানি লিখাইয়াছেন। কাব্যাংশে রামের রাজ্যাভিষেক-কালই কেকয়ীর পক্ষে স্বামীর কাছে এইরূপ পত্র লিখিবার উপযুক্ত অবসর। রাজা নিজকৃত প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়াছেন। তাই, তাঁহার আদরের ছোটরাণী অভিমান-ভরে সময়োপযোগী তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপবাণে রাজার মর্ম্মে-মর্ম্মে আঘাত যেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা করিয়াছেন। শেষে যেরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও আদরিণী রাণীর পক্ষে বড়ই স্বাভাবিক।

"কিন্তু বাক্যব্যয় আর কেন অকারণে ?
যাহা ইচ্ছা কর, দেব, কার্ সাধ্য রোধে
তোমায়, নরেন্দ্র তুমি ? কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে ? বীতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে
চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপপুরী
ভিখারিণী-বেশে দাসী ! দেশ-দেশান্তরে
ফিরিব ; যেখানে যাব, কহিব সেখানে,
পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি !"

রোষাগারে প্রবেশ করিয়া অভিমান প্রদর্শন, ঘটনা-হিসাবে মন্দ নহে ; কিন্তু কাব্যাংশে এই পত্রিকাখানি কেকয়ীর তাৎকালিক মনোভাবের চমৎকার কাব্য-চিত্র !

"থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্ম্মের প্রতিফল। দিয়া আশা মোরে,
নিরাশ করিলে আজি ; দেখিব নয়নে
তব আশা-বৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি ?

বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে
গৃহে তুমি। বামদেশে কৌশল্যা মহিষী,—
(এত যে বয়স, তবু লজ্জাহীন তুমি!)
যুবরাজ পুত্র রাম, জনক-নন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধূ,—এ সবারে লয়ে
কর ঘর, নরবর, যাই চলি' আমি।
পিতৃমাতৃহীন পুত্রে পালিবেন পিতা—
মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি।
দিব্য দিয়া মানা তারে করিব খাইতে
তব অন্ন; প্রবেশিতে তব পাপপুরে।"

স্বামীর প্রতি ক্রুদ্ধা মহিষীর বিষদগ্ধ এই বাক্যবাণগুলি প্রকৃতই নারীজনোচিত হইয়াছে।

সূর্পণখা-পত্রিকা

কবি নিজেই বলিয়াছেন যে, এই পত্রিকাখানি পড়িতে হইলে, বাল্মীকি-বর্ণিতা বিকটা সূর্পণখাকে ভুলিতে হইবে। বস্তুতঃ, রাক্ষসেরা যখন মায়াবী অর্থাৎ ইচ্ছামত মায়ারূপ ধারণ করিতে সমর্থ, তখন কাব্যানুরোধে এই প্রেম যাচঞা-পত্রিকায় সূর্পণখাকে সুরূপা করিয়া দেখাইয়া কবি কাব্যোচিত কার্য্যই করিয়াছেন;—

"—কোন্ যুবতীর নবযৌবনের মধু
বাঞ্ছা তব? অনিমেষে রূপ তার ধরি,
(কামরূপা আমি, নাথ,) সেবিব তোমারে।"

পঞ্চবটী-বনে সূর্পণখা দেখিয়াছেন যে, রামের সহিত তাঁহার স্ত্রী আছেন; কিন্তু লক্ষ্মণ "একাকী"। তাই তিনি ভাবিয়াছেন যে, লক্ষ্মণ অবিবাহিত। এ অবস্থায় বিধবা রাক্ষস-কন্যার পক্ষে লক্ষ্মণের কাছে প্রেম-যাচঞা অসঙ্গত নহে।

তাহা ছাড়া, যদি বিবাহও করিতে হয়, তাহা হইলে ভ্রাতা রাবণ সমাদরে সে কার্য্য সম্পন্ন করিবেন ;—

"চল শীঘ্র যাই দোঁহে স্বর্ণলঙ্কাধামে।
সমপাত্র মানি তোমা', পরম আদরে
অর্পিবেন শুভক্ষণে রক্ষঃকুলপতি
দাসীরে কমল-পদে। কিনিয়া, নৃমণি,
অযোধ্যা-সদৃশ রাজ্য শতেক যৌতুকে,
হবে রাজা ; দাসী-ভাবে সেবিবে এ দাসী।"

কাব্যাংশেও পত্রিকাখানি প্রকৃত প্রেমের পূর্ব্বরাগের উপযোগী হইয়াছে। রাক্ষস-কন্যা হইলেও তাঁহার হৃদয়ে প্রকৃত প্রেমের স্থান থাকিতে পারে, এ কথা ভুলিলে চলিবে না।

এই নবযৌবনে সুপুরুষ লক্ষ্মণ, শিরে জটাজূট ধারণ করিয়া, উদাসীনের বেশে পঞ্চবটী-বনে ভ্রমণ করিতেছেন, কি দুঃখে ? যে দুঃখেই হউক, রাবণের ভগিনী সূর্পণখা তাহা দূর করিতে প্রস্তুত। যদি লক্ষ্মণ শত্রু-কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, ভব-বিজয়িনী রক্ষ-অনীকিনী, চাই কি, লঙ্কার কুল-দেবতা স্বয়ং চামুণ্ডা লক্ষ্মণের পক্ষে যুদ্ধ করিবে! যদি অর্থে লক্ষ্মণের প্রয়োজন, তাহা হইলে সূর্পণখা বলিতেছেন—

"—অলকার ভাণ্ডার খুলিব
তুষিতে তোমার মন ; নতুবা কুহকে
শুষি রত্নাকরে, লুটি' দিব রত্নজালে।"

এ পৃথিবীর সুখ-সম্পদের ত' কথাই নাই, যদি মর্ত্ত্যে বসিয়া স্বর্গের সুখভোগ লক্ষ্মণের বাসনা, তবে রাবণের প্রসাদে সূর্পণখা তাহাও যোগাইতে প্রস্তুত। আর যদি উদাসীন থাকিয়া জীবন যাপন করাই লক্ষ্মণের অভিপ্রায়, সূর্পণখা তাহাতেও পশ্চাৎপদ নহে ;—

"—অম্লান বদনে
এ বেশ-ভূষণ ত্যজি', উদাসিনী-বেশে
সাজি', পূজি, উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব।

*   *   *

দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগিয়ে দুজনে!"

এইরূপে পত্রিকাখানি আদ্যন্ত কবিত্বে মণ্ডিত।

দ্রৌপদী-পত্রিকা

পাণ্ডবদিগের সহিত বিবাহিতা হইবার পরে, দ্রৌপদীর প্রিয়তম পতি অর্জ্জুনের সুদীর্ঘ স্বর্গ-প্রবাস-কালই দ্রৌপদীর পক্ষে এই বিরহ-পত্রিকাখানি লিখিবার উপযুক্ত অবসর। একেই ত তিনি পাণ্ডবদিগের সহিত মনোদুঃখে বনবাস করিতেছিলেন, তাহার উপর প্রিয়তম পতির এই সুদীর্ঘ প্রবাস! স্বর্গে ইন্দ্রালয়ে তিনি ইন্দ্রের প্রিয় অতিথি। সেখানে ভোগ-সুখের কোনও অভাবই নাই। তাহা ছাড়া, প্রলোভনের সামগ্রীও স্বর্গে সুপ্রচুর। এই-সকল ভাবিয়া মর্ত্ত্যের বিরহদগ্ধা পত্নীর স্বভাবতঃই মনে হয়;—

"—শত ফুল প্রফুল্ল যে বনে,
কি সুখে বঞ্চিত, সখে, শিলীমুখ তথা?"

সেখানে কত দেবভোগ, কত সুরবালা, কত অপ্সরা?—এমত অবস্থায় অর্জ্জুনের বিরহে দ্রৌপদীর মনে নানা আশঙ্কা হওয়াও বিচিত্র নয়। প্রকৃত আশঙ্কা না হইলেও, প্রবাসী স্বামীর প্রতি ঐ উপলক্ষ্যে একটু রঙ্গ-রসের অবতারণা করা দ্রৌপদীর ন্যায় সুরসিকা পত্নীর পক্ষে বড়ই সুন্দর হইয়াছে।

তারপর, ভাবের আবেগে দ্রৌপদী বিবাহের পূর্ব্বকার ও পরেকার অনেক কথাই অতি সংক্ষেপে ও সুন্দরভাব-মণ্ডিত করিয়া বলিয়াছেন। শেষে, অর্জ্জুনকে শীঘ্র

ফিরিয়া আসিতে বলিবার সময়ে, স্বর্গের পারিজাত গোটাকতক আনিবার অনুরোধ করিতেও ভুলেন নাই।

"ইচ্ছা বড়, গুণমণি, পরিতে অলকে—
পারিজাত ; যদি তুমি আন সঙ্গে করি,
দ্বিগুণ আদরে ফুল পরিব কুন্তলে"

বৃহৎ অনুরোধের সহিত কি সুন্দর স্ত্রীজনোচিত এই ক্ষুদ্র অনুরোধটী! এদিকে বিরহে কণ্ঠাগতপ্রাণ, স্বামীকে শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে বলা হইতেছে; আবার সেই একই নিঃশ্বাসে পারিজাত-ফুল আনিবার জন্য অনুরোধ! কবি এখানে স্ত্রীচরিত্রের উপর এক কথায় কি সুন্দর কটাক্ষই করিয়াছেন!

অবশেষে অর্জ্জুনের অভাবে বনবাসে তাঁহারা কি ভাবে কাল কাটাইতেছেন, সে সকল কথা বলিয়া অর্জ্জুনের মর্ত্তো প্রত্যাগমনেচ্ছাকে আরও বলবতী করা বুদ্ধিমতী-স্ত্রীজনোচিতই হইয়াছে। সর্ব্বশেষে সুমধুর কান্তা-বাক্য ও আশার বাণী ;—

"পাণ্ডবকুল-ভরসা, মহেষ্বাস, তুমি!
বিমুখিবে তুমি, সখে, সম্মুখ সমরে—
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শূরে ; নাশিবে কৌরবে ;
বসাইবে রাজাসনে পাণ্ডুকুলরাজে ;—
এই গীত গায় আশা নিত্য এ আশ্রমে ;
এ সঙ্গীত-ধ্বনি, দেব, শুনি জাগরণে ;—
শুনি স্বপ্নে নিশাভাগে এ সঙ্গীত-ধ্বনি!"

প্রিয়তমা পত্নীর মুখে এরূপ উত্তেজনাময়ী আশার বাণী শুনিয়া কোন্ স্বামীর হৃদয় উল্লসিত না হয়? এই উৎসাহেই অর্জ্জুন ফিরিয়া আসিবেন—ইহাই এই কান্তাবাক্যের সুন্দর সার্থকতা।

ভানুমতী-পত্রিকা

এই পত্রিকাখানি আগা-গোড়া কান্তা-বাক্য। ভীষণ কুরুক্ষেত্র-সমরে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সমবেত ও ভারতের রাজন্যবর্গ একত্র হইয়া কুরুপাণ্ডবদিগের মহাপ্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতেছে। প্রতিনিয়ত সঞ্জয়ের মুখে যুদ্ধের সংবাদ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পরিবার-বর্গ শুনিতে পাইতেছেন। ঘোরতর বিপদের কাল আসন্নপ্রায়। এই সময়েই ভানুমতীর পক্ষে কান্তা-বাক্যে দুর্য্যোধনকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিবার উপযুক্ত অবসর। তখন ভানুমতীর মনের অবস্থা কিরূপ, পত্রিকার প্রথমেই সেই কথা ;—

"কভু যাই দেবালয়ে ; কভু রাজোদ্যানে ;
কভু গৃহচূড়ে উঠি', দেখি নিরখিয়া—
রণস্থল। রেণুরাশি গগন আবরে—
ঘন ঘনজালে যেন, জ্বলে শররাশি,
বিজলীর ঝলাসম ঝলসি নয়নে !"

* * *

"কাঁদে কুরুবধূ যত ! কাঁদে উচ্চ রবে,
মায়ের আঁচল ধরি' কুরুকুল শিশু,—
তিতি' অশ্রুনীরে, না জানি' কি হেতু।
দিবানিশি এই দশা রাজ-অবরোধে।"

কুরুগৃহে আবাল-বৃদ্ধ বনিতার কি ভয়ানক মনশ্চাঞ্চল্য, দিবানিশি কি মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দন-ধ্বনি !—সদ্যো বিধবাদিগের ক্রন্দন ত আছেই, তা ছাড়া সধবারাও আসন্ন বৈধব্যে আশঙ্কিত হইয়া দিবানিশি কাঁদিতেছে ! ভানুমতী ইঁহাদের অন্যতমা। বিবাহের পর হইতেই তিনি পাণ্ডবদিগের প্রতি স্বামী দুর্য্যোধনের কুব্যবহার দেখিয়া আসিতেছেন। এদিকে আবার হিংসাপরতন্ত্র দুর্য্যোধনাদির প্রতি পাণ্ডবদিগের সদ্-

ব্যবহারও লক্ষ্য করিয়াছেন। আজ দুর্য্যোধন সেই পাণ্ডবদিগের বিনাশের জন্ম কুরুক্ষেত্র-রণে প্রবৃত্ত! ভানুমতী স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে, দুর্য্যোধন কুরু-কুলের কুপুত্র হইলেও কুমতি শকুনির ও গর্ব্বী কর্ণের পরামর্শেই তাঁহার হিতাহিত-জ্ঞান একেবারেই বিদূরিত হইয়াছে। এ যুদ্ধে কুরুকুলের সর্ব্বনাশ, এবং ভানুমতীর অদৃষ্টে বজ্রাঘাত অনিবার্য্য! দিবানিশি এই কথা ভাবিতে-ভাবিতে ভানুমতীর এখন নিদ্রাতেও সুখ নাই ;—নিদ্রা আসিলেই তিনি স্বপ্ন দেখেন,—

> "শ্বেত-অশ্ব কপিধ্বজ স্যন্দন সম্মুখে!
> রথমধ্যে কালরূপী পার্থ! বাম করে
> গাণ্ডীব কোদণ্ডোত্তম! ইরম্মদ-তেজা
> মর্ম্মভেদী দেবঅস্ত্র শোভে হে দক্ষিণে।"

এইরূপ দিবানিশি দুর্য্যোধনের প্রাণনাশ-ভয়ে ভীতা ভানুমতী এক রাত্রিতে স্বপ্নে যে ভবিষ্যৎ ঘটনা-সকল দেখিয়াছিলেন, তাহাই উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন—

> "——— দেখিনু তরাসে
> যতদূর চলে দৃষ্টি, ভীম রণভূমি!
> বহিছে শোণিত-স্রোত প্রবাহিণী-রূপে ;
> পড়িয়াছে গজরাজি, শৈলশৃঙ্গ যেন
> চূর্ণ বজ্রে ; হতগতি অশ্ব ; রথাবলী
> ভগ্ন ; শত-শত শব! কেমনে বর্ণিব
> কত যে দেখিনু, নাথ, সে কাল মশানে।
> দেখিনু রথীন্দ্র এক শরশয্যোপরি!"

স্বপ্নে অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনার করাল ছায়া দেখিয়া তিনি পত্রশেষে বলিতেছেন,—পরম হিতৈষিণী স্ত্রীর মতই বলিতেছেন :—

> "এস তুমি, প্রাণনাথ, রণ পরিহরি'!

পঞ্চখানি গ্রাম মাত্র মাগে পঞ্চরথী !
কি অভাব তব, কহ ? তোষ পঞ্চজনে ;
তোষ অন্ধ বাপ মায়, তোষ অভাগীরে—
রক্ষ কুরুকুল ওহে কুরুকুলমণি !"

দুঃশলা-পত্রিকা

ভানুমতী-পত্রিকার ন্যায় এই পত্রিকাখানিও কান্তা-বাক্য। স্বামী জয়দ্রথ, শ্যালক দুর্য্যোধনের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ কবিবাব জন্য নিজরাজ্য সিন্ধুদেশ হইতে আসিয়া কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে যোগ দিয়াছেন। তাঁহার পত্নী, ধৃতবাষ্ট্রকন্যা দুঃশলা দেবীও স্বামীর সঙ্গে আসিয়া পিতৃগৃহে বাস করিতেছেন। এই ভীষণ যুদ্ধে পিতৃকুলের জন্য, বিশেষতঃ স্বামীব জন্য, উৎকণ্ঠিতা হওয়া তাঁহাব পক্ষে স্বাভাবিক। তাই প্রতিদিন দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন সঞ্জয় যখন ধৃতবাষ্ট্রের কাছে যুদ্ধেব ঘটনা সকল বিবৃত করিতে থাকেন, তখন উৎকণ্ঠিতা কন্যাও পিতাব নিকট বসিয়া সঞ্জয়েব মুখে সেই-সব যুদ্ধবার্ত্তা না শুনিয়া থাকিতেই পারেন না, ইহা বলা বাহুল্য।

এখানে একটী অবান্তর কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। ভানুমতী ঐ বাড়ীর বধূ ; কাযেই তাঁহার পত্রিকায় দেখা যায়—

"স্তম্ভেব আড়ালে, দেব, দাঁড়ায়ে নীরবে
শুনি সঞ্জয়ের মুখে যুদ্ধের বারতা।"

কিন্তু দুঃশলা ঐ বাড়ীর কন্যা বলিয়া, তাঁহার পত্রিকারম্ভে আছে,—

"———— মধ্যাহ্নে বসিনু
অন্ধ পিতৃ পদতলে, সঞ্জয়ের মুখে
শুনিতে রণের বার্ত্তা।"

বাড়ীর বধূ ও কন্যার আচরণের এই সামান্য প্রভেদটুকু দেখাইতে কবি বিস্মৃত হয়েন নাই।

যুদ্ধবার্ত্তা শুনিতে-শুনিতে সঞ্জয়ের মুখে দুঃশলা শুনিলেন যে, ব্যূহমধ্যে অর্জ্জুনের বীরপুত্র অভিমন্যুকে কুরুপক্ষের সপ্তরথীর কেহই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। পরে তাঁহারা একত্র হইয়া অভিমন্যুকে নিহত কবিলেন। ইহার পরেই সঞ্জয় বলিয়া উঠিলেন,—

"———উঠ, কুরুকুলপতি!
পূজ কুলদেবে শীঘ্র জামাতার হেতু!
ওই দেখ, কপিধ্বজে ধাইছে ফাল্গুনি
অধীর বিষম শোকে!" —

জয়দ্রথ সদলবলে ব্যূহমুখ রোধ করিয়াছেন; তাই বীর অভিমন্যু সপ্তরথী-বেষ্টিত হইয়া ব্যূহ মধ্যে নিহত হইলেন! এই সংবাদে ভীমবাহু অর্জ্জুন পুত্রবধের প্রতিশোধ লইবার জন্য মুহুর্মুহু গাণ্ডীব আস্ফালন কবিতে-কবিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন;

"কোথা জয়দ্রথ এবে—রোধিল যে বলে
ব্যূহমুখ? শুন, কহি, ক্ষত্ররথী যত;
তুমি হে বসুধা, শুন; তুমি জলনিধি,
তুমি স্বর্গ, শুন; তুমি পাতাল, পাতালে;
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তাবা; জীব এ জগতে
আছ যত, শুন সবে! না বিনাশি যদি
কালি জয়দ্রথে রণে, মরিব আপনি!
অগ্নিকুণ্ডে পশি' তবে যাব ভূতদেশে,
না ধরিব অস্ত্র আর এ ভব-সংসারে!"—

পুত্রশোকে মহা ক্রোধান্ধ, প্রচণ্ড-গাণ্ডীব-ধারী অর্জ্জুনের এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া দুঃশলার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয় —

"অজ্ঞান হইয়া অমি পিতৃপদতলে
পড়িনু! যতনে মোরে আনিয়াছে হেথা—
এই অন্তঃপুরে চেড়ী পিতার আদেশে।"

পরে জ্ঞানলাভ করিয়া, দুঃশলা কান্তা-বাক্যে স্বামীকে নানারূপে বুঝাইলে শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে লিখিতেছেন। এই কাল-সমরে কুরু-কুল ধ্বংস হইবে—এই ভবিষ্য ঘটনার সমর্থন-স্বরূপ দুর্য্যোধনের জন্মকালে যে-যে অমঙ্গল-সূচক ঘটনা ঘটিয়াছিল, দুঃশলা যেমন শুনিয়াছেন, নারীজনোচিত ভাবে পতির কাছে সে কথাগুলি বিবৃত করিতে ভুলিলেন না ;—

"———শুনিয়াছি আমি, যে দিন জন্মিলা
জ্যেষ্ঠভ্রাতা, অমঙ্গল ঘটিল সে দিনে!
নাদিল কাতরে শিবা ; কুক্কুর কাঁদিল
কোলাহলে ; শূন্যমার্গে গর্জ্জিল ভীষণে
শকুনি-গৃধিনীপাল! কহিলা জনকে
বিদুর,—সুমতি তাত,—'ত্যজ এ নন্দনে,
কুরুরাজ! কুরুবংশ ধ্বংসরূপে আজি
অবতীর্ণ তব গৃহে!' না শুনিলা পিতা
সে কথা! ভুলিলা, হায়, মোহের ছলনে!
ফলিল সে ফল এবে,—নিশ্চয় ফলিল!"

তাই দুঃশলা বলিতেছেন,—তুমি সিন্ধুদেশের অধিপতি, সে সুখের রাজত্ব ছাড়িয়া কায কি তোমার এ কাল-সমরে যোগ দিয়া?—

"তবে যদি কুরুরাজে ভালবাস তুমি
মম হেতু, প্রাণনাথ ; দেখ ভাবি' মনে,
সম-প্রেমপাত্র তব কুন্তীপুত্র বলী।

ভ্রাতা মোর কুরুরাজ ; ভ্রাতা পাণ্ডুপতি !
এক জন জন্যে কেন ত্যজ অন্য জনে ;—
কুটুম্ব উভয় তব !—আর কি কহিব ?
কি ভেদ, হে, নদদ্বয়ে,—জন্ম হিমাদ্রিতে ?"

যদি দোষগুণ ধরিতে চাও, তবে—

"ভ্রাতার সুকীর্ত্তি যত, জাননা কি তুমি ?
লিখিতে শরমে, নাথ, না সরে লেখনী।"

তারপর, দুঃশলা, অর্জ্জুনের বীরপণা, এবং কুরুসেনানায়কদিগের অকর্ম্মণ্যতার উদাহরণ দিয়া, পরে বলিতেছেন,—

"এ কালাগ্নিকুণ্ডে, কহ, কি সাধে পশিবে ?
কি সাধে ডুবিবে, হায়, এ অতল জলে ?"

ইহার পর দুঃশলা কান্তা-বাক্যেব চবম করিলেন,—শিশু মণিভদ্রের উল্লেখ করিয়া ;—যদি মণিভদ্রের কথা ভাবিয়াও জয়দ্রথ ফিরিয়া আসেন, এই আশায়।

দুঃশলা এমনও আশঙ্কা করিতেছেন যে, হয়ত তাঁহার স্বামী ভাবিতে পারেন, কুরুপক্ষে দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি থাকিতে, মহারথী কর্ণ থাকিতে, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও গদাপাণি দুর্য্যোধন থাকিতে, তাঁহার ভয় কি ? তাই দুঃশলা বলিতেছেন,—পতিগতপ্রাণা কান্তার মতই বলিতেছেন,—

"শুনো না নাথ, ও মোহিনী বাণী !
হায়, মরীচিকা আশা ভব-মরুভূমে !
মুদি আঁখি ভাবো,—দাসী পড়ি' পদতলে,—
পদতলে মণিভদ্র কাঁদিছে নীরবে !"

অবশেষে দুঃশলার মিনতি ;—

"———এস ছদ্মবেশে,
না ক'য়ে কাহারে কিছু ! অবিলম্বে যাব
এ পাপ-নগর ত্যজি' সিন্ধুরাজালয়ে !
কপোতমিথুন-সম যাব উড়ি' নীড়ে !—
ঘটুক যা থাকে ভাগ্যে কুরুপাণ্ডুকুলে।"

দুঃশলার এই ঘোব বিপদের দিনে চবম কান্তা-বাক্য এই পত্রিকাখানি।

জাহ্নবী-পত্রিকা

মনে হয়, একজন লেখক ইংবাজী "রোম্যান্‌টিক্" শব্দের বাঙ্গালা কবিয়াছিলেন, "রোমাঞ্চকব"। ঐ অর্থে এই পত্রিকাখানি বাস্তবিকই রোম্যান্‌টিক্। শান্তনু ও জাহ্নবীর বিবাহ, দাম্পত্য-অবস্থা এবং অবশেষে শান্তনুকে ছাড়িয়া জাহ্নবীর প্রস্থান—সবই অতিমাত্রায় বিস্ময়কর। শাপভ্রষ্টা জাহ্নবী দেবী অভিশপ্ত অষ্টবসুকে গর্ভে ধারণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া মর্ত্ত্যে আসেন। পরে, রাজা শান্তনুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সে সময়ে শান্তনুর সহিত কথা ছিল যে, জাহ্নবীর কোনও কার্য্যে রাজা প্রতিবাদ করিলেই, তৎক্ষণাৎ তিনি চলিয়া যাইবেন। অভিশপ্ত অষ্টবসুকে একে-একে জন্ম-মাত্রই গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের মর্ত্ত্যবাসের সংক্ষেপ করিয়া দিবেন, বসুদিগেব কাছে জাহ্নবী এরূপ প্রতিশ্রুতাও ছিলেন। বিবাহান্তে জাহ্নবী কর্ত্তৃক উপর্য্যুপরি সাতটী শিশুর ঐরূপ নিধনে, রাজা অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়াও পত্নীর প্রতি প্রীতিবশতঃ জাহ্নবীকে কিছুই বলেন নাই। অবশেষে অষ্টম বসুকে (ইনিই মহাভারতের দেবব্রত ভীষ্ম—আদি-পর্ব্ব দেখ) জাহ্নবী ঐরূপে গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিতে চাহিলে, শান্তনু আপত্তি না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অঙ্গীকার-ভঙ্গ হইল দেখিয়া, শিশুটিকে সঙ্গে লইয়া জাহ্নবী চলিয়া গেলেন। ইহাতে পত্নীর বিরহে রাজা বড়ই কাতর হইয়া, গঙ্গাতীরে বহুকাল কাটাইতে থাকিলে, জাহ্নবী দেবী, বয়ঃপ্রাপ্ত সেই বালককে

দিয়া শান্তনুর কাছে এই পত্রখানি প্রেরণ করেন। ইহাতে ঐ সমস্ত কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া, জাহ্নবী বলিতেছেন,—

"পত্নীভাবে আর তুমি ভেবোনা আমারে !

*　　*　　*

তরুণ যৌবন তব ;—যাও ফিরি' দেশে ;—
কাতরা বিরহে তব হস্তিনা-নগরী !
যাও ফিরি', নরবর, আন গৃহে বরি',
বরাঙ্গী রাজেন্দ্রবালে ; কর রাজ্য সুখে

*　　*　　*

—পূর্ব্ব কথা ভুলি',
করি' ধৌত ভক্তিরসে কামগত মনঃ
প্রণম সাষ্টাঙ্গে, রাজা ! শৈলেন্দ্র-নন্দিনী,
রুদ্রেন্দ্র-গৃহিনী গঙ্গা আশীষে তোমারে !
লয়ে সঙ্গে পুত্রধনে যাও রঙ্গে চলি'
হস্তিনায়, হস্তিগতি ! অন্তরীক্ষে থাকি'
তবপুরে, তব সুখে হইব, হে, সুখী,
তনয়ের বিধুমুখ হেরি' দিবানিশি !

কি sublime ! অদ্ভুত রসের কি রোমাঞ্চকর অভিব্যক্তি ! আগাগোড়া, বিস্ময় এই পত্রিকাখানির স্থায়িভাব।

উর্ব্বশী-পত্রিকা

স্বর্গের অপ্সরা-শ্রেষ্ঠা উর্ব্বশী তাঁহার সখী চিত্রলেখাকে সঙ্গে লইয়া কুবের ভবন হইতে ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে হিরণ্যপুরবাসী কেশী-নামক দৈত্য তাঁহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। রাজা পুরুরবা সূর্য্যমণ্ডল হইতে প্রত্যাগমন-কালে

আকাশপথে অন্যান্য অপ্সরাগণের মুখে ঐকথা শুনিয়া দৈত্য-হস্ত হইতে সখীসহ উর্ব্বশীকে উদ্ধার করেন। মূর্চ্ছান্তে উর্ব্বশী রাজার রূপ দর্শনে মনে মনে তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ আসক্তা হইয়া পড়েন। এ অবস্থায় স্বর্গে এক রাত্রিতে দেবগণ সমক্ষে একখানি নাটকের অভিনয়-কালে উর্ব্বশীর মুখ হইতে অকস্মাৎ ভুলক্রমে এমন কথা বাহির হইল, যাহা নাটকাভিনয়ের অপ্রাসঙ্গিক, অথচ রাজা পুরুরবার প্রতি প্রণয়াসক্তি-ব্যঞ্জক। ফলে, স্বর্গীয় নাট্যাচার্য্য ভরত-ঋষির শাপে তখনই উর্ব্বশী স্বর্গভ্রষ্টা হইলেন। মর্ত্তে আসিবার পূর্ব্বে তিনি এই পত্রখানি লিখিয়া সখী চিত্রলেখাকে দিয়া রাজা পুরুরবার কাছে প্রেরণ করেন।

কিরূপে তিনি স্বর্গভ্রষ্টা হইলেন, পত্রিকারম্ভে সেই কথা বলিয়া পরে রাজা কর্ত্তৃক দৈত্যহস্ত হইতে তাঁহার উদ্ধার এবং চেতনাপ্রাপ্তির পর তাঁহার সম্বন্ধে রাজা যাহা-যাহা বলিয়াছিলেন, সেই-সব কথার উল্লেখ করিয়া, রাজার প্রতি উর্ব্বশীর মন যে কিরূপ আসক্ত হইয়াছে, পত্রিকায় তাহাই কবিত্বের সহিত সুন্দর ভাবে বর্ণিত।

উর্ব্বশীর এই প্রেমমাল্য রূপজ মোহের চাকচিক্যে ঝলমল্ করিতে থাকিলেও উহা গভীর কৃতজ্ঞতার সূত্রে গ্রথিত বলিয়া মনোরম। রূপজমোহাত্মক হইলেও এ প্রেম গাঢ় কৃতজ্ঞতায় মহিমান্বিত। পত্রিকাখানি রোম্যাণ্টিক্ প্রেমের সুন্দর আদর্শ। পত্র-শেষে উর্ব্বশী লিখিয়াছেন,—

"থাকিব নিরখি' পথ, স্থির-আঁখি হ'য়ে
উত্তরার্থে পৃথ্বীনাথ!—নিবেদনমিতি।"

জনা-পত্রিকা

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য অশ্বের সহিত অর্জ্জুন দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইয়া মাহেশ্বরী পুরীতে আসিলে, সেখানকার রাজা নীলধ্বজের পুত্র প্রবীর অর্জ্জুনকে বাধা দেন এবং অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে নিহত হয়েন। নীলধ্বজ এই সংবাদে

কোথায় প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের ন্যায় অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন, না, একেবারে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় পুত্রঘাতী শত্রুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাঁহার সহিত পরম মিত্রতা স্থাপন করিয়া, পরিশেষে তাঁহার সহিত হস্তিনাপুরে যাইতেও স্বীকৃত হইলেন! তাহাতে তদীয় মহিষী, ক্ষত্রিয়-কন্যা জনা স্বামীর এই কাপুরুষোচিত ব্যবহারে ব্যথিতা ও ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহাকে এই পত্রিকাখানি লিখিয়াছেন।

ইহাতে জনা-হৃদয়ের ক্ষত্র-তেজ ছত্রে-ছত্রে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিস্ফুরিত—

——"তব সিংহাসনে
বসেছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে!
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি রতনে!
* * *
——"কেমনে তুমি, মিত্রভাবে
পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত? ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম এই কি নৃমণি?"

তারপরে, তিনি ক্ষোভে, রোষে, পাণ্ডব-চরিতের, কুন্তীর, দ্রৌপদীর, এমন কি ব্যাসদেবের আচরণের প্রতিকূল ব্যাখ্যা করিয়া মনের রাগ ব্যক্ত করিতে কিছুমাত্র বাকি রাখেন নাই। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ-সভায় ক্রুদ্ধ শিশুপাল যেমন কৃষ্ণ-চরিতের প্রতিকূল ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এখানে পুত্রশোকে পাগলিনীপ্রায় ক্ষত্র-কন্যা জনার উক্তিও তদ্রূপ। এই কটূক্তি সকল পড়িবার সময়ে পাঠকের মনে রাখিতে হইবে যে, ক্রুদ্ধা ফণিনীর মুখে বিষই উদ্গীর্ণ হইয়া থাকে!

মহারথী অর্জ্জুনের বীর-চরিত-গর্ব্বকেও খর্ব্ব করিতে জনা কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই;—

"জানি আমি কহে লোক রথিকুলপতি
পার্থ। মিথ্যা কথা, নাথ;—বিবেচনা কর,
সূক্ষ্ম-বিবেচক মি বিখ্যাত জগতে।—

ছদ্মবেশে লক্ষ রাজে ছলিল দুর্ম্মতি
স্বয়ম্বরে। যথাসাধ্য কে যুঝিল কহ,
ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে, কোন্ ক্ষত্ররথী,
সে সংগ্রামে? রাজদলে তেঁই সে জিতিল।
দহিল খাণ্ডব দুষ্ট, কৃষ্ণের সহায়ে।
শিখণ্ডির সহকারে কুরুক্ষেত্র-রণে
পৌরব-গৌরব ভীষ্ম বৃদ্ধ পিতামহে
সংহারিল মহাপাপী! দ্রোণাচার্য্য গুরু—
কি কুছলে নরাধম বধিল তাঁহারে,
দেখ স্মরি! বসুন্ধরা গ্রাসিল সরোষে
রথচক্র যবে, হায়, যবে ব্রহ্মশাপে
বিকল সমরে, মরি, কর্ণ মহাযশাঃ—
নাশিল বর্ব্বর তাঁরে। কহ মোরে, শুনি,
মহারথি-প্রথা কি, হে, এই, মহারথি?"

তারপর মৃত পুত্রের উদ্দেশে মাতৃজনোচিত হৃদয়-বিদারী শোকোচ্ছ্বাসের পর অবশেষে জনা বলিতেছেন—

"যাও চলি মহাবল যাও কুরুপুরে
নব মিত্র পার্থ সহ! মহাযাত্রা করি'
চলিল অভাগা জনা পুত্রের উদ্দেশে!
ক্ষত্রকুলবালা আমি; ক্ষত্রকুলবধূ;—
কেমনে এ অপমান স'ব ধৈর্য্য ধরি'?
ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে;
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্ত নগরে
লভি অন্তে! যাচি চিরবিদায় ও পদে!"

হস্তিনাপুরে অমোদ-প্রমোদ শেষ করিয়া ,—

"ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি'
নরেশ্বর, 'কোথা জনা ?' বলি' ডাক যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি—'কোথা জনা ?' বলি !"

মাত্র দুইটি ছত্রে রাজপুরীর ভীষণ শূন্যতার শব্দচিত্রে স্তম্ভিত হইতে হয় !

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে বঙ্গ-বাণীর সেবায় ব্রতী হইয়া, প্রায় চারি-বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য-প্রতীচ্য-সম্মিলন-সম্ভূত, সর্ব্বাংশে নূতন ধরণের এক অপূর্ব্ব সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া, কাব্য-প্রতিভার মধ্যাহ্নেই, তাঁহার চির-কল্পিত বাসনা সফল করিতে, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ যাত্রা করেন। ইউরোপ-গমনের জন্য এই প্রবল বাসনাই তাঁহার প্রদীপ্ত কাব্য-প্রতিভানলকে প্রশমিত করিয়াছিল। এই সময়ে লিখিত তাঁহার এক পত্রে আছে ;—

But I suppose, my poetical career is drawing to a close. I am making arrangements to go to England to study for the Bar and must bid adieu to the Muse।

(কিন্তু বোধ হয় আমার কবি-জীবন শেষ হইয়া আসিতেছে। আমি ব্যারিষ্টার হইবার জন্য ইংলণ্ডে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি ; সুতরাং আমাকে কবিতা-দেবীর কাছে বিদায় লইতেই হইল।)

এই প্রবল বাসনার বশে তিনি তাঁহার কাব্য-প্রতিভাকে প্রশমিত করিতে বাধ্য না হইলে, বোধ হয়, আমরা বীরাঙ্গনার দ্বিতীয় ভাগ, ব্রজাঙ্গনার অন্যান্য সর্গ এবং আরও কত কি পাইতে পারিতাম !* সম্ভবতঃ, চতুর্দ্দশপদী কবিতার গ্রন্থও পাইতাম। তিনি যখন মেঘনাদবধ কাব্যের ৩য় সর্গ রচনা করিতেছিলেন, তখন

---

* বীরাঙ্গনা-কাব্য ২১ খানি পত্রিকায় শেষ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। ব্রজাঙ্গনা কাব্যের শেষে আছে—"ইতি শ্রীব্রজাঙ্গনা-কাব্যে বিরহো নাম প্রথমঃ সর্গঃ"—ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অন্যান্য সর্গ লিখিবার কল্পনাও তাঁহার ছিল। ইহা ছাড়া, আরও কাব্য-নাটকাদির কল্পনা যে তাহার মনে ধূমায়িত হইতেছিল, তাহা তাঁহার তৎকাল-লিখিত পত্রগুলি হইতে বুঝা যায়।

একদিন নিম্নলিখিত চতুর্দ্দশপদী কবিতাটি লিখিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজনারায়ণকে পাঠাইয়া দেন এবং লেখেন—

I want to introduce the sonnet into our Language and some mornings ago made the following :—

কবি মাতৃভাষা

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য ; তা' সবে আমি অবহেলা করি',
অর্থলোভে দেশে-দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি'
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি',
তাঁহার সেবায় সদা স'পি' কায়-মন।
বঙ্গ-কুললক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—"হে বৎস, দেখি' তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব ; তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি, হে, আজি, কহ ধন পতি ?—
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে ?"

What say you to this, my good friend ? In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian.

এইটাই বঙ্গভাষায় প্রথম সনেট্‌। ইহার পরে তিনি আরও কয়েকখানি

কাব্যাদি লিখিয়া তাড়াতাড়ি বিলাতে গেলেন। এখানে থাকিতে সনেট্ আর লেখেন নাই।

ইউরোপে গিয়া মধুসূদন এমন দারুণ অর্থ-কষ্টে পড়িয়াছিলেন যে, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহায়তা না পাইলে, সপরিবারে তাঁহার যে কি দুর্গতি হইত, তাহা ভাবিতে পারা যায় না। এইরূপ কষ্টের সময়েও তিনি কিরূপ উৎসাহের সহিত নানা ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা এবং সেই-সব ভাষার উৎকৃষ্ট কাব্যাদি পাঠ রিতেন, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। বস্তুতঃ মধুসূদনের মত কাব্য-প্রিয় লোক জগতে কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত তাঁহার এক পত্র হইতে জানা যায়, সেই সময়ে তিনি ইতালীয় সুপ্রসিদ্ধ কবি পেত্রার্কার চতুর্দ্দশপদী-কাব্য পড়িয়া বাঙ্গালায় সেইরূপ ছন্দের কতকগুলি কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন। সেই সময়ে তিনি তাঁহার প্রিয় বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখিয়াছিলেন;—

You again date your letter from Bagirhat. Is this "Bagirhat" on the bank of my own native river? I have been lately reading Petrarca--the Italian Poet, and scribbling some "sonnets" after his manner. There is one addressed to this very river কবতক্ষ. I send you this and another—the latter has been very much liked by several European friends of mine to whom I have been translating it. I dare say, you will like it too. Pray, get these sonnets copied and sent to Jatindra and Rajnarain and let me know what they think of them. I dare say, the sonnet "চতুর্দ্দশপদী" will do wonderfully well in our language. I hope to come out with a small volume, one of these days. I add a third: I flatter myself that since the day of his death, ভারতচন্দ্র রায় never had such an *elegant* compliment paid to him. There is a variety for you, my friend. I should wish you to show these things to Rajendra also, for he is a good judge. Write to me

what you all think of this new style of poetry. Believe me my dear friend our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up, such of us as owing to early defective education, know little of it and have learnt to despise it are miserably wrong. It is, or rather, it has the elements of a great language in it. I wish I could devote myself to its cultivation : but as you know, I have not sufficient means to lead a literary life and do nothing in the shape of real work for a living.

(তোমার পত্র পুনরায় বাগেরহাট থেকে লেখা। এই বাগেরহাটই কি আমার জন্মভূমি প্রবাহিণীর তীরবর্ত্তী? আমি সম্প্রতি ইতালীর কবি পেত্রার্কার কাব্য পড়িতেছিলাম এবং তদনুকরণে কতকগুলি চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা করিয়াছি। উহাদের মধ্যে একটী ঐ কবতক্ষ নদীর উদ্দেশ্যেই লিখিত। সেইটী এবং আর একটী তোমাকে পাঠাইলাম। শেষেরটীর মৎকৃত অনুবাদ পড়িয়া, এখানে আমার কয়েকজন ইউরোপীয় বন্ধুর উহা বড়ই ভাল লাগিয়াছে। আমি বলিতে পারি, তোমারও ভাল লাগিবে। তুমি ঐ দুইটী নকল করাইয়া যতীন (১) ও রাজনারায়ণকে (২) পাঠাবে এবং তাঁহাদের মতামত আমায় জানাবে। চতুর্দ্দশপদী কবিতা আমাদের ভাষায় চমৎকার লাগিবে, ইহা বলিতে আমি সাহস হয়। শীঘ্রই আমার ক্ষুদ্র একখণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হইবে, আশা করিতেছি। আর একটী কবিতাও তোমায় পাঠাই ভারতচন্দ্র রায় তাঁহার মৃত্যুর পরে, এমন সুন্দর প্রশংসাবাদ আর কাহারও নিকট পান নাই, এই বলিয়া আমি আত্মপ্রশংসা করিতে পারি। এইরূপ নানা বিষয়ে কবিতা থাকিবে। রাজেন্দ্র (৩) এ বিষয় ভাল বুঝেন। ইচ্ছা করি তাঁহাকেও ঐ কবিতাগুলি দেখাবে। এই নূতন ধরণের কবিতা সম্বন্ধে তোমাদের সকলের কি মত, আমায়

---

(১) ৺মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর।
(২) ৺রাজনারায়ণ বসু। (৩) ৺রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র।

ভাই, সত্যই বলিতেছি, আমাদের বাঙ্গালা ভাষা অতি সুন্দর। প্রতিভাশালী লোকদের হাতে ইহা মার্জ্জিত হওয়া চাই মাত্র। আমাদের মধ্যে যাহারা তাঁহাদের অসম্পূর্ণ শিক্ষার দোষে, এই ভাষা প্রায় জানেন না বলিলেই হয়, অথচ উহাকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছেন তাঁহারা অতি শোচনীয়রূপে ভ্রান্ত। ইহাকে মহাভাষা অথবা মহাভাষার উপকরণগুলি এই ভাষায় বিদ্যমান, এ কথা বলা যাইতে পারে। এই ভাষার অনুশীলনে জীবন উৎসর্গ করিতে আমার ইচ্ছা হয়। কিন্তু তুমিত জান, আমার এমন কিছু আয় নাই যে, জীবিকার জন্য প্রকৃত-পক্ষে কোন কাজ না করিয়া, কেবলমাত্র সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়া জীবন কাটাইতে পারি)।

এই পত্রে বঙ্গভাষা সম্বন্ধে কবির যে মনোগত ভাবটি ব্যক্ত, তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতেও ঠিক সেই সুর কাব্যাকারে ধ্বনিত হইয়াছে ;—

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা' সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, এ দেশে থাকিতে তিনি যে চতুর্দ্দশপদী কবিতাটী লিখিয়া রাজনারায়ণকে পাঠাইয়াছিলেন, এ কবিতাটী ঠিক তাহারই প্রতিধ্বনি—

এইরূপে চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর সর্ব্বত্রই কবির নানাবিধ-মনোভাব কাব্যাকারে পরিস্ফুট। এই কবিতাগুলি বর্ণনাত্মক কবিতা নহে ;—প্রায় সকলগুলিই বস্তু-অবলম্বনে ভাবাত্মক কবিতা। সুদূর প্রবাসে বসিয়া অবসর-কালে, বাল্যের কথা, স্বদেশের কথা, স্মৃতিপথে উদিত হওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। উহাতে প্রবাসী মাত্রেরই হৃদয় এক-প্রকার করুণ আনন্দে আপ্লুত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রবাসী কবির হৃদয়ে সেই আনন্দ কাব্য-শ্রীধারণ করিয়া মুঞ্জরিত হইয়া উঠিবে, ইহাত হইবারই কথা। সুদূর ফ্রান্স-দেশে অমরাবতী-সদৃশ ভার্সেলস্ নগরে বসিয়া, কবি তাঁহার সেই "জন্মভূমি-স্তনে দুগ্ধ-স্রোতোরূপী

কবতক্ষ নদ," যাহা তাঁহার মনঃক্ষেত্রে বাল্য স্মৃতির সহিত চির-প্রবাহিত; সেই "বটবৃক্ষ," বাল্যে যাহার সুশীতল ছায়ায় বসিয়া তিনি তাঁহার আ-শৈশব প্রিয় রামায়ণ পাঠ করিতেন; "আশ্বিন মাস", যাহা তাঁহাকে বাল্যের সেই দুর্গোৎসবের কথা স্মরণ করাইয়া নয়নে বারি ধারা বহাইয়া দিত; "দেবদোল", 'শ্রীপঞ্চমী' এবং সেই "কোজাগর-লক্ষ্মী-পূজা", যাহার স্মরণে তিনি নিজের জন্য নহে, বঙ্গের জন্য ভিক্ষা মাগিয়াছেন;—

"থাক বঙ্গ গৃহে, যথা মানসে, মা, হাসে
চির-রুচি কোকনদ; বাসে কোকনদে
সুগন্ধ, সুরত্নে জ্যোৎস্না, সু-তারা আকাশে,
শুক্তির উদরে মুক্তা, মুক্তি গঙ্গা-হ্রদে।"

রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, যাহা তাঁহার চির-সহচর স্বদেশী কবি কালিদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম, জয়দেব, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, আর বিদেশী কবি দান্তে, ভিক্তর হ্যুগো, টেনিসন্ যাঁহাদের কবিত্ব-রসে তাঁহার মনোভৃঙ্গ মত্ত থাকিত; করুণা-সিন্ধু' বিদ্যাসাগর, যাঁহার 'সুবর্ণ-চরণে" আশ্রয় পাইয়া কবির ঘোরতর দুঃসময় নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গিয়াছিল – এ সকলই এই কবিতাবলীতে সুন্দর কাব্য-শ্রী ধারণ করিয়াছে। তিনি নিজের কবিত্ব-প্রতিভা সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সজাগ থাকিয়াও, পূর্ব্ব কবিদিগের প্রতি যেরূপ সশ্রদ্ধ অনুরাগ যে ভাবে বন্দনা করিয়াছেন তাহাতে তাহা এ যুগে বড়ই দুর্লভ। এ-সব ছাড়া, আরও বিবিধ প্রকারের মনোভাব এই ক্ষুদ্র কাব্যখানিতে কবিত্বে চিত্রিত হইয়াছে।

কবি উচ্চাঙ্গের ইংরাজী-শিক্ষিত হইলেও, কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম (কবিকঙ্কণ), জয়দেব, ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বরগুপ্তের প্রতি তাঁহার কি চমৎকার উদার ও সহৃদয় মনোভাব ছিল, এই কবিতাবলীতে তাহা সুন্দর অভিব্যক্ত।

ইউরোপে অর্থ-কষ্টে তাঁহার কাব্য-প্রতিভা ক্রমে নির্ব্বাপিত হইয়া আসিতেছিল, ইহা কবি নিজেই বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে

এই কবিতাবলীই তাঁহার নির্ব্বাণ-প্রায় প্রতিভাগ্নির শেষ-শিখা! তাই তাঁহার "সমাপ্তে" কবিতায় করুণরসে আর্দ্র হইতে হয়।

"বিসর্জ্জিব আজি, মাগো, বিস্মৃতির জলে!
(হৃদয় মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি।
ও প্রতিমা। * নারিনু চিনিতে তোমারে
শৈশবে অবোধ আমি। ডাকিলা যৌবনে;
(যদিও অধম পুত্র মা কি ভুলে তারে?)
এবে—ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি' যাই দূর বনে
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ ভারত-রতনে।"

কত অনাহারে, অনিদ্রায়, বরদার সেবা করিয়া শেষে বিদায় কালে কবি বর চাহিলেন—

জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ, ভারত রতনে!

ইহার পূর্ব্বে কবি লক্ষ্মীর কাছেও বঙ্গের জন্য এইরূপ ভিক্ষা করিয়াছেন। ইহা হইতেই আমরা কবির মনোমধ্যে যে গভীর স্বদেশ-হিতৈষণার উৎস বিদ্যমান ছিল, তাহার সন্ধান পাই।

"কবি-মাতৃভাষা" বাঙ্গলায় আদি চতুর্দ্দশপদী কবিতা একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। নীতিগর্ভ কবিতাগুলির মধ্যে 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা' ও 'ময়ূর ও গৌরী' এই দুইটী ফ্রান্সে প্রবাস-কালে এবং অন্যগুলি জীবনের শেষভাগে রচিত। ফ্রান্সে থাকিতে, বোধ হয়, ফ্রান্স-দেশীয় কবি Jean De La Fontaine এর গল্প কবিতার অনুকরণে মধুসূদন সেইরূপ ভাঙ্গা মিত্রাক্ষর ছন্দে বালক-বালিকাদের পাঠোপযোগী

নীতিগর্ভ কবিতা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। জীবনের শেষভাগে দারিদ্র্য ও রোগ প্রপীড়িত হইয়াও তিনি যে এমন সরল ও সুখপাঠ্য কবিতাগুলি রচনা করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। তবে বেশী লিখিতে পারেন নাই ;—সে অবস্থায় বেশী লিখিবার সম্ভাবনাও ছিল না।

অন্যান্য কবিতার মধ্যে "আত্মবিলাপ" কাব্যাংশে অতি উৎকৃষ্ট কবিতা। মানব-জীবনে আশার নিষ্ফলতায় মন কিরূপ ব্যথিত হয়, এই কবিতাটী সেই ব্যাথার কাব্য-চিত্র। সংস্কৃতে হইলে, এই কবিতাটী মোহ-মুদ্গরের অযোগ্য হইত না। ইহা ১৮৬১ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই সময়েই কবি নিজ জীবনে নানা আশার নিষ্ফলতা নিদারুণ-ভাবে অনুভব করিতেছিলেন। কবিতাটী তাঁহার ভবিষ্যৎ-জীবনেরও দ্যোতক ;—কবিরা বাস্তবিকই দূরদর্শী।

"বঙ্গভূমির প্রতি" কবিতাটী তিনি যখন তাঁহার প্রদীপ্ত কাব্য-প্রতিভায় জলাঞ্জলি দিয়া ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ-যাত্রায় উদ্যোগী হইলেন তখন ঐ কবিতাটি লিখিয়া, তিনি 'শ্যামা'- জননী বঙ্গভূমির কাছে বিদায় লইয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার লিখিত পত্রে আছে—

Well I am off, my dear Rajnarain! Heaven alone, knows if we are to see each other again! But you must not forget your friend. It's a long separation;—four years! But what is to be done? Remember your friend and take care of his fame.

Being a poetaster, I would not think of bolting away without rhyming and I enclose the result—and I hope the thing is,—if not good—at least *respectable.*

বঙ্গভূমির প্রতি

My Native Land, Good-Night !—*Byron*,"

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো, না গো, তব মনঃ কোকনদে।

*　　　*　　　*

ফুটি যেন স্মৃতি জলে, মানসে, মা যথা ফলে
মধুময় তামরস, কি বসন্ত কি শরদে ॥

কবিতাটি বঙ্গ জননীর পদে কবির করুণ আত্ম নিবেদন। প্রবাস-যাত্রা কালের বিদায় গ্রহণ হইলেও, এখন ইহা আমাদের মনে তাঁহার চির-বিদায় স্মরণ করাইয়া দেয়। কবির প্রার্থনা সফল হইয়াছে—বঙ্গজননীর মনঃ-কোকনদ "মধুহীন" হয় নাই, হইবেও না; —তাঁহার স্মৃতি-সরোবরে "মধুময় তামরস" চির-প্রস্ফুটিত হইয়া আছে ও থাকিবে।